কমলাকান্তের পত্র

To talk of many things
Of shoes and ships and sealing wax
Of cabbages and kings.

আশ্বিন, ১৩৩০
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
চন্দননগর

কমলাকান্তের পত্র

১

প্রসন্ন গোয়ালিনীর বাড়ী পূজা

সকাল বেলাই আফিমখোরের ঘুমের সময়, বেশ চিনি-ঘুম্‌টি এসেছে কি আসে-নি এমন সময় দরজায় ধাক্কা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নর মধুর গলায় কোন অনির্দ্দিষ্ট লোকের উপর গালি বর্ষণের সঙ্গীতে আমার ঘুমটা চটে গেল, মেজাজটাও চটে গেল—প্রসন্ন তখন বল্লে, "ওগো উঠেছ, এত বেলা হ'ল—এখনও উঠ নাই কি গো, আমার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে—"

সর্ব্বনাশের কথা শুনে চম্‌কে উঠলাম—এমন অকালে ঘুম ভাঙ্গানটা সর্ব্বনাশের সূচনাই শাস্ত্রমতে বলে' থাকে; যা'হক দরজা খুলে দিলাম প্রসন্ন ঘরের মেঝেয় মাথায় হাত দিয়ে বসে প'ড়ল—বল্লাম, "হয়েছে কি, সর্ব্বনাশ কি, সর্ব্বনাশ কিসের—গরু মরেছে, না দুধ বেরালে খেয়ে গেছে?" প্রসন্ন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে একটা অযথা দুর্ব্বাক্য বলে' বল্লে—"তোমার কোন কালে আক্কেল হ'ল না, লোকে

আমার অনেক পয়সা দেখেছে, কাল রাত্রিতে আমার বাড়ী ঠাকুর ফেলে দিয়ে গেছে—আমি এখন কোথায় যাই, কি করি!" আমি বল্লাম, "তা হ'লে আমার যে আক্কেল হয়নি সেটা রাগের মাথায়ই বলেচ, আমার কাছে না-হ'লে বুদ্ধি নিতে এসেছ কেন? দেখ প্রসন্ন, পরের ধন আর নিজের বুদ্ধি সকলেই বেশী দেখে; আর দুধে অনেক জল ঢেলেচ বা অনেক জলে দুধ ঢেলেচ, তাতে পয়সা করেচ কি না তা জানি না—তবু না হয় একবার মা'র পূজা কল্লে—তাতে ক্ষতি কি, পূজার পুণ্যি আছে ত?" প্রসন্ন রাগিয়া বলিল—"তুমিও আমার পয়সা দেখচ, হা কপাল!" তখন আমি বল্লাম—"তবে এক কাজ কর, ঠাকুরখানার ত এখনও মুণ্ড বসেনি, ওটা একটা কাঠামই ধরিয়া লও—ওটাকে উনানজাত করিয়া ফেল, আপদ মিটে যাক্!"—প্রসন্ন বল্লে, "তা কি হয়?"—আমি বল্লাম—"এও না ও-ও না—পূজো কর্ত্তেও ইচ্ছে আবার না কর্ত্তেও ইচ্ছে, এতে আর আমি কি বলি বল।" প্রসন্ন বল্লে—"আমার যখন ইচ্ছে হয় তখন করবো, লোকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে জোর করে' পূজা করাবে এ কি কথা?"—তখন আমি বল্লাম, "দেখ প্রসন্ন তুমি গয়লার মেয়ে সে তত্ত্বকথা তুমি বুঝবে কিনা জানিনা—তবে আজকালকার সব পূজাই একরকম ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া পূজা বা ফেলা পূজা; তোমার পাড়াপড়শি তোমার বাড়ী ঠাকুর ফেলে দিয়ে গেছে, আর সব না হয় তাদের পূর্ব্ব পুরুষরা তাদের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে গেছে এইমাত্র প্রভেদ,—মা'র রূপ, মা'র শক্তি, মা'র ঐশ্বর্য্য সম্যক হৃদয়ে ধারণ করে' মা'র আরাধনার কাল বহুদিন

বাঙ্গালা দেশ থেকে চলে গেছে, তা তুমি আর দুঃখ কর না—ভক্তিভরে পূজা করগে, তোমার গয়লা-বংশ উদ্ধার হয়ে যাবে। তবে একটা কাজ কর্ত্তে হবে, একবার উকিল বাড়ী যেতে হবে—"

প্রসন্ন আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"পূজা করব ত উকিল বাড়ী যাব কেন ?—পুরুত বাড়ি বলছ বুঝি।"

আমি বল্লাম— "না না, আমি নেশার ঝোঁকে কথা কইচি না, উকিল বাড়ীই যেতে বলছি।" প্রসন্ন হাঁ করে' রইল—আমি বল্লাম,—"হাঁ করে' থেক না, মুখটি বুজে আমি যা বলি তা কর—এরাজ্যে পূজার প্রথম ব্যবস্থা উকিল মোক্তারেই করে' থাকে, তারপর পূজারীর কাজ সম্ভব হয়।" তখনও হাবা গয়লার মেয়ে ঝোঝে না, বল্লে, "উকিল বাড়ী পূজার ব্যবস্থা ত এই আমি নূতন শুনলাম।" আমি বল্লাম—"কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী—প্রসন্ন, যে রাজ্যের যে ব্যবস্থা, আর যে কালের যে রীতি, দশপ্রহরণধারিণী মা আমার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তোমার বাড়ী বিদেশ বিভুঁই থেকে আসবেন—তার একটা পন্নার করে' না রাখলে শেষে বিপদে পড়বে।"

"তোমার কথাবার্ত্তা আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি না" বলে' সে গালে হাত দিয়ে বসে রইল। আমি বল্লাম—"প্রসন্ন, তুমি যদি এত সহজে আইনের কথা বুঝতে পারতে তা'হলে আইন করাই যে বৃথা হ'ত— তা বুঝচ না। বুঝিয়ে বলি শোন—এই যে দেশটী দেখচ, যার একদিকে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী আর তিনদিকে পগার তোলা—এইটা দেশ, আর এর বাইরে যে বিশাল বাংলা দেশটা পড়ে আছে সেটা বিদেশ, সুদূর হিমালয়ের ত কথাই নাই;—সেই দূর

হিমালয়-গৃহ থেকে যে মা নেমে তোমার বাড়ীতে আসবেন, তিনি ত বিদেশিনী বলেই পরিগৃহীতা হবেন—এই দেশে প্রবেশাধিকার লাভ কর্ত্তে হলে তাঁর একটা ছাড়-পত্র চাই; তারপর তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে' আসবেন, ২০ জনের অধিক হলেই ত আইনের খেলাপ হয়ে যাবে। তার উপর আবার তিনি দশপ্রহরণ দশহাতে ধারণ করে' আসবেন, অস্ত্র আইনের মধ্যেও পড়তে পারেন, এ সকল জটিল কথার মীমাংসা করবার জন্য একবার উকিলের বাড়ী যেতেই হবে।

প্রসন্ন। তুমি আফিঙের দর সস্তা দেখে এ দেশে এসে বাস কল্লে, আমি ত তোমায় বৃদ্ধ বয়সে ছেড়ে কোথায় গেলাম না, শেষে এমন দেশে এলে যে পূজা করতে গেলে উকিল বাড়ী যেতে হ'বে!

আমি। তা প্রসন্ন সব সুবিধা কি এক সঙ্গে পাওয়া যায়, তবে মন্দের ভাল এই, এখানকার আইনগুলা প্রায়ই ঘুমিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে এক-একটা প্রবল হয়ে জেগে ওঠে, কোন্‌টা কোন্‌দিন জেগে উঠবে তা বলা যায় না, তাই আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভাল।

প্রসন্ন। এই সব অদ্ভুত আইনের দরকার কি?

আমি। দেখ প্রসন্ন অনধিকার চর্চ্চা কর না, তুমি আদার ব্যাপারী জাহাজের কি খবর রাখ? তার উপর তুমি গয়লার মেয়ে, দুধের ব্যবসাই বোঝ, রাজ্য পরিচালনার কথা কি জান?— এ যে-রাজার দেশ সে-রাজার রাজ্যে নাকি জনতা থেকেই ঘোর বিপ্লব হয়েছিল, সে আজ প্রায় দু'শ বছরের উপর, কিন্তু তা'তে কি এল গেল—এদের সেই দু'শ বছর আগে যে ঘর পুড়েছিল—এরা এখনও তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। কোন রকম জটলা হলেই এঁরা আঁৎকে উঠেন—তা সেটা

বন্ধু-ভোজনের জন্যই হউক, পূজা-পাঠের জন্যই হউক আর নৃত্য-গীতের জন্যই হউক।”

প্রসন্ন তখন হতাশ হয়ে বল্লে— তা আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি করে’ উকিল বাড়ী যাই, কাজটা ভাগাভাগি করে’ নাও—তুমি উকিল বাড়ী যেও, আমি পুরুত বাড়ী যাব এখন। কিন্তু এমন দেশে কি মানুষ বাস করে?—এই বলিয়া প্রসন্ন বিষণ্ণ বদনে উঠিয়া গেল।

———

২

বিজয়া

সন্ধ্যার পর প্রসন্ন অতি ম্লানমুখে আমার কুটীরের দাওয়ার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল, দূরে ঠাকুরবিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছিল; শানাইয়ের করুণ সুর জনকোলাহল ভেদ করিয়া জানাইতেছিল—এ বৎসরের মত বাঙ্গালীর পূজার অর্থাৎ দুর্গাপূজার উৎসব শেষ হইল।

প্রসন্ন কোন কথা না কহিয়া অতি ধীরে আমার কাছে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া একটা গড় করিল। আমি প্রসন্নকে বলিলাম—প্রসন্ন! আজ সব ফ্যাসাদ মিটিয়া গেল ত?

প্রসন্ন। দেখ, যেদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া উঠানে ঠাকুরপ্রতিমা ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে দেখিলাম সেদিন আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কত আর্ত্তনাদ করিয়া তোমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল কি বিপদেই পড়িলাম। আজও তোমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজ বুঝিতে পারিতেছি না—কেন তখন আপনাকে এত বিপন্ন মনে করিয়াছিলাম।

আজ ছুটিয়া আসিয়াছি—বাড়ীতে আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার ক্ষুদ্র কুটীর যেন কত বড় কত ফাঁকা মনে হইতেছে; মনে হইতেছে যে, গ্রামের সমস্ত লোককে আমার উঠানে জড় করিলেও যেন সে ফাঁক ভরিয়া উঠিবে না। এমন নিস্তব্ধ নির্জ্জন স্থান আমি কখনও কোথাও দেখি নাই। আমি সেখানে কেমন করিয়া থাকিব জানি না।

আমি। কোন্‌টা নির্জ্জন মনে হচ্ছে ঠিক বুঝতে পাচ্চ কি? —মনের ভিতরটা, না ঘরের ভিতরটা?

প্রসন্ন। কি জানি! আমার ছেলে নাই মেয়ে নাই—আঁচল দিয়া প্রতিমার চরণ যখন মুছাইয়া লইলাম, তখন আমার বুকের ভিতর যে কি রকম করিয়া উঠিল, তাহা আমি বলিতে পারি না—যেন আমারই মেয়ে আমার গৃহ শূন্য করিয়া স্বামীর বাড়ী চলিয়া যাইতেছে। সে কষ্ট কেমন তাহা, আমি মা নই, ঠিক বলিতে পারি না, তবে আমার মনে হয় ঐ রকমই। আমার মনে হইল, মা'র চোখেও যেন জল দেখিলাম! পাড়ার মেয়ে শ্বশুরঘর করিতে চলিয়াছে, মা'র চোখে জল, মেয়ের চোখে জল, দেখাদেখি আমারও চোখে জল আসিয়াছে, কিন্তু এমনতর কষ্ট তো তখন হয় নাই। এখন বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সব যেন শূন্য মনে হইতেছে।

আমি। এতগুলা টাকা যে বাজে খরচ হইয়া গেল, প্রসন্ন! সেটা কি একবারও মনে হচ্ছে না?

প্রসন্ন। মোটেই না। আমার মনে হইতেছে টাকা দিয়া কেনা যায় না এমন-একটা-কিছু ভাগ্যক্রমে পাইয়াছিলাম, আজ তাহা

হারাইয়াছি, আর বুঝি তা কখনও ফিরিয়া পাইব না।

আমি মনে মনে এই মাতৃপূজার প্রবর্ত্তক মহাপুরুষকে কোটি কোটি প্রণাম করিলাম। বলিহারি তোমার রচনা। এই 'আভাঙ্গা' গয়লার মেয়ের মনকে কি আশ্চর্য্য উপায়ে তোমার শিক্ষা-পদ্ধতি তার এই দুর্নিবার চূড়ান্ত ঐশ্বর্য্য ধনসম্পদের আবিল আবর্ত্ত হইতে উত্তোলন করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের দিকে তুলিয়া লইল ; এ গয়লার মেয়ে স্বল্পকালের জন্যও তোমার অদ্ভুত সৃষ্টি কৌশলে এমন এক ভাব রাজ্যে নীত হইল যে, সে আর মণিকে মণি বলিয়া মানিল না. টাকার চেয়েও একটা কিছু বড়—একটা কিছু প্রিয়তর ইষ্টতর জিনিষের ইঙ্গিত পাইল। বলিহারি তোমার কল্পনা। এই পার্থিব জীবনে পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, পুরুষ-নারী সকলেরই তো ঐহিকতার অগ্নিকুণ্ড হইতে পরিত্রাণ আবশ্যক। এই পরিত্রাণের কি অদ্ভুত পথই না তুমি আবিষ্কার করিয়াছ! বেদান্তের গভীর সিদ্ধান্তগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষকে যদি টোলের প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হইত, তাহা হইলে বাস্তবিকই এই এক জন্মের সাধনায় বর্ণপরিচয়ও শেষ হইত না ; কেবল তাই নয়, মানুষ তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য এক এক করিয়া চতুঃষষ্টিসহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়াও বুঝি তৃপ্ত হইতে পারিত না। অথচ তাহার সে ক্ষুধা তাহাকে নিবৃত্ত করিতেই হইবে, নহিলে তাহার মুক্তি নাই। এই মুক্তি যদি তাহাকে বুদ্ধির ধাপে ধাপে উঠিয়া অর্জ্জন করিতে হইত তাহা হইলে তাহা চিরকালই অর্জ্জনের বস্তুই থাকিয়া যাইত, অর্জ্জিত আর হইত না। কেবল বুদ্ধি

দিয়াই যদি তাহা অর্জ্জনসাধ্য হইত তাহা হইলে নিত্যানন্দ প্রভু লৌহহৃদয় জগাইমাধাইকে টোলে পড়িবারই পরামর্শ দিতেন, হৃদয়ের তন্ত্রীবিশেষে আঘাত করিয়া সেই লৌহহৃদয়কে কলধৌতে পরিণত করিতেন না। মানব হৃদয়ের সেই নিগূঢ় রহস্যজ্ঞান লইয়া, হে শিল্পী তুমি যে মাতৃমূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছ তাহা তুলনাতীত। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।

৩

স্বপ্নলব্ধ রক্ষাকবচ

তখন একটু মৌজেই ছিলাম বলিতে হইবে, প্রসন্ন আসিয়া আমার দাওয়ায় খুঁটি ঠেসান দিয়া বসিল—বলিল, গরুটা বড় ধ্যাড়াচ্ছে !

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা একনিমিষে ঘুরিয়া আসিয়া মনটা বেশ একটু তরতরে জলের স্রোতের মত স্নায়বিক হিল্লোলের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছিল, প্রসন্নর গলার আওয়াজে একটু থামিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—কতক তাহার কথার সায় হিসাবে এবং কতকটা স্বগত বলিয়া উঠিল—"আজকাল অনেকেই তাই কচ্চে বটে !"

তখনও প্রসন্নর মুখখানা আমি ভাল করিয়া দেখি নাই, যখন দেখিলাম, তখন আশঙ্কা হইল, বুঝিবা নেশার ঝোঁকে কিছু বেফাঁস বলিয়া ফেলিয়াছি, বলিলাম, "কি প্রসন্ন ! অমন ভ্রূ দুটা কুঞ্চিত করিয়া আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছ কেন ? আমি সজ্ঞানে আছি ত !"

প্রসন্ন বলিল—"তা বুঝতে পাচ্চি। আমি অনেকের কথা বল্‌চি না—আমার মঙ্গলার কথা বলচি, গরুটা বড় ধ্যাড়াচ্চে—দুধ কমে গেছে—"

আমি। হ্যাঁ সেটা ভাবনার কথা বটে—দুধ কমে যাওয়াটা ভাবনারই কথা—কিন্তু ও দুটা প্রক্রিয়া সঙ্গের সাথী—একটা হলেই আর একটা 'কেন নিবার্য্যতে।' মানুষই বল আর গরুই বল—ধ্যাড়ালেই অর্থাৎ দেহের রসের পরিপাক না হলেই—বুদ্ধি কম হবে, কাজ কম হবে, ফসল কম হবে, দুধ কম হবে—যার যেমন। কারণ শাস্ত্র বলেচেন—রসো বৈ সঃ, তিনিই রস, তিনিই গরুর বাঁটের দুধ—শিল্পীর রসোদ্গার, বিশ্বপ্রপঞ্চের সুসার, সৌন্দর্য্য।

প্রসন্ন। নাও কথা—এখনও ঘোর কাটেনি দেখচি—বলি গরুটার একটা ওষুধবিশুধ বাৎলে দিতে পার—যাতে তোমার ঐ রস না মাথা পরিপাক হয়ে যায়?

আমি। প্রসন্ন তুমি আমাকে এতদিনেও চিন্‌লে না ত, এইটেই সবচেয়ে নিদারুণ ছুরিকাঘাত—(cruellest cut of all). আমি কি গো-বদ্দি? মানুষের ওরোগ হলে বরং একটা ব্যবস্থার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু গরু—ছি প্রসন্ন, তোমায় আবার বলি আমি গো-বদ্দি নই।

প্রসন্ন একটুও অপ্রতিভ না হয়ে, হাজারহোক নিছক গয়লার মেয়ে বইত নয়, বল্লে—"কেউটে ধরতে পার আর হেলে ধর্ত্তে পার না; মানুষের বদহজম নিবারণ কর্ত্তে পার আর গরুর পার না?"

আমি। দেখ—আজ দেশসুদ্ধ সব বদহজমে ভুগছে, মন আর দেহ দুই শীর্ণ হয়ে যাচ্চে, রসের পরিপাক হচ্চে না, গায়েও গত্তি লাগ্‌চে না, মনেও নয়। বিরুদ্ধ ভোজন, অভোজন, স্বল্পভোজন—এ সবই বদহজমের কারণ।

প্রসন্ন। আমি তোমায় বদহজমের নিদান আওড়াতে বলচি না গো, কবিরাজ মহাশয়, আমাকে একটা উপায় বলে' দাও, গরুটা যাতে বাঁচে, দুধটা রক্ষা হয়—

হাজার হোক মেয়েমানুষ, তাতে গয়লার মেয়ে, আমি যত বিষয়টাকে বড় করে' দেখতে চাই, সে তত গোঁজে-বাঁধা-গরুর মত ঘুরে ঘুরে গোঁজের গোড়ায় চলে' আসে—অতএব গতিরন্যথা হয়ে, আমাকে গরুকেই কেন্দ্র করে' ভাবতে হ'ল—আবার নেশাখোর বলে' গাল দেবে—আমি ঐ গালটা বড় বরদাস্ত করিতে পারি না।

আমি বলিলাম—প্রসন্ন, কতরকম টোটকা আছে, তুক আছে, মাদুলী আছে, তাই একটা শিঙে বেঁধে দাও না, কিছুই কর্ত্তে হবে না— সব সেরে যাবে।

প্রসন্ন একেবারে আগুন হয়ে উঠল—তবে সে মেয়েমানুষ আগুন, খুব ভয়ের আগুন না হলেও যখন দপ্ করে' জ্বলে উঠে তখন ভয় লাগিয়ে দেয় বটে, বল্লে—"আমি টোটকা ফোটকা বুঝিনে —ওসব বুজরুকিতে কিছু হবে না—শেষে একদিন দেখবে, গরুর হাড় জুড়িয়ে গেছে, আর তোমার দুধ খাওয়াও ঘুচেচে।"

আমি একেবারে দমে গেলাম—গয়লার মেয়ে টোটকা মানে না, মাদুলী মানে না, হল কি? বলিলাম—"প্রসন্ন তুমিও কি হাল ফ্যাসান মত কেবল বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান বই কিছু চাওনা নাকি?—কিন্তু তুমি কি বুঝ, ঐ ওদের বিজ্ঞানের ভিতর কতটা টোটকা আর কতখানি বিশিষ্ট জ্ঞান!"

প্রসন্ন। আমি অত বুঝতে চাই না, আজকাল গরুর গা ফুঁড়ে

ওষুধ দেয়, আর গরু সেরে যায়, তার একটা ব্যবস্থা করতে পার?

আমি। সেটাও টোটকা তবে ভিতরের টোটকা, আর মাদুলী বাইরের টোটকা, এইমাত্র প্রভেদ। কিসে কি হয় তা যখন কোনটাতেই ঠিক জানা নেই, তখন ছুঁচের ডগায় শরীরের ভিতর চালাইয়া দাও, আর বাহিরে গলায় মাদুলী করিয়া ঝুলাইয়া রাখ একই কথা—শরীর-মনের দেবতা যদি ঔষধ গ্রহণ করিলেন ত ঔষধ ফলিল—আর না গ্রহণ করিলেন ত সব ঔষধ ভাসিয়া গেল। তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া ঔষধ গ্রহণ করান যখন মানুষের সাধ্য নহে—তখন মাদুলিও যা আর বিজ্ঞানসম্মত ঔষধও তাই। প্রসীদ প্রসীদ বলে' জীবনদেবতাকে প্রসন্ন কর, আর মাদুলী পর—এই প্রকৃষ্ট উপায়।

প্রসন্ন। তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি না—মিছে রাগ করিয়াই বা কি করি বল—প্রসন্ন হতাশ হইয়া বসিয়া রহিল।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম—প্রসন্ন, যাদের দেশে বিজ্ঞান রসায়ন ইত্যাদির বহু স্ফুরণের ফলস্বরূপ গতযুদ্ধে শত শত লোক মরিল—তাহাদের দেশে প্রতিদিনের কার্য্যে, গৃহস্থলীতে, সমাজে, রাষ্ট্রীয়-ব্যাপারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে, বেচাকেনার মধ্যে কত টোটকা, পদক, রক্ষাকবচ, Mascot ব্যবহার হয় তা তুমি জান? তুমি একেবারে বিজ্ঞানভক্ত বিদুষী হইয়া উঠিয়াছ, মানুষ যতদিন না সর্ব্বশক্তিমানের বুড়ী হইয়া উঠিতেছে, ততদিন এসব চলিবেই চলিবে, তা কি তুমি জান? রোগ হইলে ডাক্তার ডাক—আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই, ডাক্তারটা একটা চলতি রক্ষাকবচ মাত্র, রোগমুক্ত হওয়া না হওয়া যে দেবতার অনুগ্রহ, তাঁহার সহিত পরিচয় ডাক্তার

বাবুর নাই, তবে তিনি উপস্থিত হইলে তুমি বেশী একটু বল পাও, একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পার এই মাত্র ; সব টোটকার উদ্দেশ্যও তাই—তোমাকে বল দেওয়া, ধৈর্য্য দেওয়া, দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবার অধ্যবসায় দেওয়া ইত্যাদি।

প্রসন্ন এতক্ষণ হাবুডুবু খাইতেছিল, এখন একেবারে তলাইয়া গেল, কোন্ দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একেবারে চুপ হইয়া গেল।

আমি বলিলাম—"প্রসন্ন অমন চুপ করিয়া থাকা ত তোমাদের স্বধর্ম্ম নহে, যা-হয় একটা-কিছু বল, নহিলে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া যাই।" প্রসন্ন একেবারে মুখে ওলপ দিয়াছিল।

আমি বলিলাম—প্রসন্ন, দেখ তোমার বিজ্ঞানসম্মত ঔষধ দেওয়ায় বিপত্তিও আছে—অনেক সময় চিকিৎসাবিভ্রাটও হয়, বিপরীত চিকিৎসাও হয়—মাদুলি বা টোটকায় সে আশঙ্কা একেবারেই নাই। লাগিল যদি ত দৈবানুগ্রহে একেবারে রাতকে দিন করিয়া দিল—আর না লাগিল যদি ত কোন আশঙ্কা নাই। বিরুদ্ধ কিছু হইবার আশঙ্কা মোটেই নাই। একটা বিজ্ঞানের ঢেউ আসিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশ সনাতন ধর্ম্মের দেশ, অনেক ঢেউ কাটাইয়া আমরা আজ তিন হাজার বৎসর বাঁচিয়া আছি—এ ঢেউটাও কাটাইয়া উঠিব। এই দেখনা সমগ্র দেশটায় যে অহজম রোগ ধরিয়াছে, ভালমন্দ কিছুই পরিপাক হইতেছে না—দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তাহার বিজ্ঞানসম্মত ঔষধ প্রয়োগ করিতে গিয়া যখন বোমা ফাটিল তখন একে আর হইয়া দাঁড়াইল! এখন দেশের মাথা যাঁরা, তাঁরা সকলেই

বুঝিলেন যে বিজ্ঞান সম্মত হইলে কি হয় ওটা আমাদের ধাতুসম্মত নহে, অতএব পরিত্যজ্য। সে পথ ত্যাগ করিয়া দেশের রাজাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈলাক্ত করিয়া (constitutional agitation) কার্য্য হাসিল করিবার ধূম পড়িয়া গেল—তাহার ফলে নূতন কাউন্সিল গড়িয়া উঠিল, তাহাও আজ মাকাল ফল বলিয়া পরিত্যজ্য মনে হইতেছে, যে হেতু সেটাও আমাদের শরীর ধাতুর (constitution) অনুকূল নহে। কিন্তু এইবার যে পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রসন্ন, আর ভাবনা নাই, এই পথ প্রকৃষ্ট পথ, আমাদের ধাতুর অনুকূল পথ, আমাদের সনাতন পথ,—দেবতার শরণাপন্ন হও, আর মাদুলি পর, এপথে কোন ভাবনা চিন্তা নাই, বিপরীত ফলোদগমের কোন আশঙ্কা নাই, শত সহস্র লোক এই পথ অনুসরণ করিয়াছে, আর ভাবনা নাই।

প্রসন্ন হঠাৎ উঠিয়া তীরবেগে আমার উঠান পার হইয়া চলিয়া গেল—"গরুটা ভাগাড়ে যাক ভাল করে' দুধ খেয়ো'খন"—এই বলিয়া আমার দিকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি দেখিলাম—আমার উঠানটা ভারতবর্ষব্যাপি বিস্তৃত বিরাট হইয়াছে, কত নদনদী, কত পর্ব্বত, কত বন, কত নগরনগরী, কত গ্রাম, কত কুটীর, কত নরনারী কিলিকিলি করিতেছে, সব গান্ধীর টুপী পরিয়া, খদ্দর পরিয়া, নিশ্চিন্তমনে আপনাপন ছোটবড় কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছে, আকাশ বাতাস ভরিয়া গান্ধীর নাম উচ্চারিত হইতেছে—সকলের গলায় এক এক গান্ধী-রক্ষাকবচ।

———

৩

মেকি

প্রসন্ন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—"দেখ গা, কে আমার মাথা খেতে একটা মেকি টাকা দিয়েছে - চল্‌চে না, কেউ নিচ্চে না, কি করি বল দেখি ?"

আমি। রোখ শোধ হ'য়ে গেছে, প্রসন্ন ; তুমি যেমন মেকি দুধ চালিয়েছ, সেও তেমনি মেকি টাকা দিয়েছে, মন্দ কি ? আঘ্রাণের মূল্য আওয়াজ, গন্ধের মূল্য শব্দ—সে গল্প ত জান—তেমনি জোলো দুধের মূল্য মেকি টাকা, তা' ত ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু মেকি চল্‌চে না, এটা ত নূতন কথা শুন্‌লাম—চল্‌তে চল্‌তে তোমার কাছ পর্য্যন্ত এসে কি তার দম ফুরিয়ে গেল—তা'ত হ'তেই পারে না।

প্রসন্ন অভিমান-ভরে বলিল—আমি জোলো দুধই তোমায় খাওয়াই কি না, নেমকহারামি কোরো না।

আমি বলিলাম—না প্রসন্ন খাঁটি যদি কিছু থাকে ত সে তোমার দুধ, আর আমার আফিম, আর সবই ঝুটা।

প্রসন্ন। নাও, তোমার বাজে কথা রাখ, এখন টাকাটার উপায় কি করি বল দেখি ?

মেকি

আমি। দেখ, আমরা তখন ছোট, আমাদের পাড়ায় এক বুড়ী ময়রাণি ছিল, সে যত অখাদ্য খাবার তৈরী করত, একদিন তা'কে বল্লাম, হ্যাগা তোমার এসব লক্ষ্মীছাড়া খাবার কেউ কেনে? সে বল্লে, 'বাবু জন্মালে মৃত্যু আছেই. ও-গুলা লক্ষ্মীছাড়াই হ'ক আর লক্ষ্মীমন্তই হ'ক যখন জন্মেচে তখন মরবেই।' তোমাকেও তাই বলি জন্মালে মৃত্যু আছেই; এ আজব দুনিয়া; যখন টাকাটি জন্মেচে, আর চলে' চলে' এতদূর এসেছে, তখন আরও অনেক দূর যাবেই।

তবে মেকিকে মেকি বলে' সত্য সত্য জান্‌লে আর চলে না। মেকি বলে' জেনেচ কি অচল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মেকি বা মায়া বলে' বুঝেছ কি আর বিশ্বপ্রপঞ্চ তোমার কাছে না থাকার সামিল; তুমি যে-মুহূর্ত্তে টাকাটাকে মেকি বলে' সন্দেহ করেচ অমনি তোমার কাছে সেটা আর টাকা নয়, টাকার রূপ থাকলেও সেটা টাকা ছাড়া আর কিছু।

এখন কথা হচ্চে টাকাটি তোমার কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছিল কি প্রকারে। হয় কেউ মেকি জানিতে পারেন নাই নচেৎ না-জানার ভান করিয়াছেন, আর সাচ্চা টাকার দলে মিশাইয়া অন্ধকারে চালাইয়া দিয়াছেন। এই রকম করিয়া তোমাকেও চালাইতে হইবে। এই রকম করিয়া কত বড় বড় মেকি চলিয়া গেল। গেলিলিও অঙ্ক পাতিয়া জানিলেন যে পৃথিবী স্থিরা নহেন। কিন্তু যতক্ষণ না তাহা না-জানার ভান করিলেন, ততক্ষণ তাঁর অন্ধতমসাচ্ছন্ন কারাগৃহ হইতে অব্যাহতি হইল না। পৃথিবী অচলা এই বিশ্বাসের ভান করিবামাত্র তিনিও আলোর মুখ

দেখিলেন, আর চিরদিনের মেকি মতটাও চলিতে থাকিল।

তোমরা যে টিপ পর, কাজল পর, পাতা কাট, আল্‌তা পর, গহনা পর, রঙ্গীন শাড়ী পর—এটা কতখানি মেকি চালাইবার সরঞ্জাম তা ত বুঝিতে পার? আর এই সরল উপায়ে ত মেকি চলিয়াও যায়! পরচুলা ও বাঁধান দাঁত, corset ও cosmetic, সে'ও ত চলে! কেন চলে? যে দেখে সে দেখিয়াও দেখে না, বা না-দেখার ভান করে—আর যে দেখায় সে সত্যকার দেখাটাকে ধূপছায়ার মধ্যে, আলো-আঁধারের মধ্যে যতটা পারে এড়াইবার চেষ্টা করে। এই আলো-আঁধারের মধ্যে কত টিকি, তিলক, বহির্বাস চলে' যাচ্ছে, কত public spirit, philanthropy চলে যাচ্ছে, ঐ পথে মেকি টাকাটা ত চলিয়া আসিয়াছে এবং চলিয়া যাইবে, তুমি ভেব না।

প্রসন্ন। তা বলে' কি লোকে ঘসে মেজে বাজিয়ে দেখে নেয় না বল্‌তে চাও?

আমি। সে দিকে, জীবনটা বড় ক্ষুদ্র যে প্রসন্ন, বাজিয়ে দেখতে দেখতে বাজি ভোর হ'য়ে যাবে, এ সুদীর্ঘ পথ আবার বাজিয়ে দেখতে দেখতে ফুরাবে না। আর বাজিয়ে দেখাও কি সোজা আর সুখের মনে কর? বাজিয়ে দেখতে দেখতে যে কত মেকিই ধরা পড়ে যাবে তা'র ইয়ত্তা আছে কি? সব ঝুটা হ্যায়—বলে' শেষে মানুষ পাগল হ'য়ে যাবে যে!

আর ঘসে মেজে নেবারই যদি চেষ্টা করা যায় যেমন বিবেকের কষ্টি-পাথরে গিল্‌টি ধরা পড় পড় হয়েছে, অমনি চারিদিক থেকে হাঁ হাঁ করে' বলে' উঠবে—ওটা অপৌরুষেয় বেদবাক্য, ওটা mystery, ওটা

লীলা, ওখানে ও কষ্টি-পাথর চল্‌বে না ; ওখানে হৃদয় দিয়ে দেখতে হ'বে, অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হবে। অথবা—ওটা expediency বা practical politics, ওখানে অত idealistic হ'লে চলবে না। তুমি সেখানে কোন্‌টা মানবে ; দশজন ভক্তের রোষকষায়িত রক্ত চক্ষুগুলি মান্‌বে, না তোমার বুদ্ধিকে মান্‌বে ? তুমি, 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে সুখের চেয়ে স্বস্তিকে, বোঝার চেয়ে অন্ধকারকেই বরণ করে' নিয়ে চির অন্ধকারের প্রতীক্ষায় বসে' থাকবে !

প্রসন্ন। তবে উপায় কি স্পষ্ট করে' বল না, আমি তোমার ও-সব কথা বুঝতে পারি না।

প্রসন্নর মত ধীর শ্রোতা পাইলে অনেকেই বক্তা হইতে পারিতেন এ কথা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি ! বুঝিতে পারে না অথচ স্থির হইয়া শুনিয়া যায় এমন শ্রোতা কি মিলে ? খুব ভক্তি অথবা খুব ভয়, অথবা দুই'এর সমবায় হইলে, তবে না বুঝিলেও লোক স্থির থাকিতে পারে ; এখানে ভয়ও ছিল না ভক্তিও ছিল না, কেন না প্রসন্ন ভয় করিবার মেয়ে নয়,—আর আমার মত নীরস আফিংখোরকে ভক্তি করিবে কে ?

প্রসন্ন। ওগো একটা উপায় বল, আমার ষোল ষোল আনা পয়সা জলে যাচ্চে ? বেটারা দুধ খেয়েচে না......খেয়েচে।

আমি। হাঁ তাই না হয় খেয়েচে। কিন্তু প্রায় বিনামূল্যে, তা'তে তাদের তত বেশী লোকসান হয় নি যত তোমার হয়েচে। তুমি যদি টাকাটী চালাতে চাও ত চিরন্তন প্রথা অনুসারে, চক্ষু বুজিয়া গোটাকতক ভাল টাকার সঙ্গে মেকিটাকে চালাইয়া দাও, সৎসঙ্গে

কাশীবাস, দশটার সঙ্গে চলিয়া যাইবেই। আর যদিই বা ধরা পড়, 'অবাক করেচে মা' বলিয়া আকাশ থেকে পড়িও, একটু আর্ত্তনাদ করিও, এবং বারান্তরে অন্যত্র চেষ্টা করিও—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

প্রসন্ন। আমার ভয় করে, কে কি বল্‌বে, কি মনে করবে!

আমি। তা হলে হবে না, বেপরোয়া হ'য়ে কাজ করতে হবে—বুক ফুলিয়ে চল্‌তে হবে; এটাও একটা মেকি চালাবার প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রীকৃষ্ণ বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর অবলীলাক্রমে গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোকুলবাসী গোপগোপীগণকে ইন্দ্র-দেবের বর্ষণবন্যা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, একথা বেপরওয়া হ'য়ে যদি বেদব্যাস না বলিয়া, একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিতেন, যে শ্রীকৃষ্ণের হাতের কব্জিতে পরদিন একটু চুনে-হলুদ দিতে হইয়াছিল, তাহা হইলে তা'তে তাঁর বলবত্তার কিছুই কমি হইত না বটে, কিন্তু তাহার ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্ণ লীলা না হইয়া বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব মধ্যে পড়িয়া যাইত; বেদব্যাসের অসমসাহসিকতার ফলে উহা তর্কের অতীত হইয়া রহিয়াছে। অতএব ভয় পাইলে সব মাটি হইয়া যাইবে।

আর আগে যে সঙ্গ বা সঙ্ঘের কথা বলেছি—অমন মেকি চালাবার উপায় আর দুটি নেই। বুদ্ধদেবের আমল হ'তে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত কত সঙ্ঘ গেছে এসেছে, অমন মেকি চালাবার আড্ডা আর কোথাও হবে না। সাচ্চা লোক কেউ-না-কেউ সব সঙ্ঘেই ছিলেন, কিন্তু সেটা সঙ্ঘের গুণে নহে, সঙ্ঘ ছিল তাঁহাদের গুণে,

একটার গুণে দশটা মেকি চলে' যেত ও যাচ্ছে, আর দশটা ভাল টাকার সঙ্গে তোমার একটা মেকি চলবে না?

প্রসন্নর মন উঠল না, সে বোকা গয়লার মেয়ে বলে' উঠল—অত-শত্তয় কাজ নেই, আমার পয়সা ত জলেই গেছে, আমি টাকাটা পুকুরের জলে ফেলে দেব, আপদ নিশ্চিন্দি!

৫

আঁটকুড়ী

আমি। তুমি অত রাগ করছ কেন তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না, প্রসন্ন।

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না, তা'র গর্জ্জন তখন বর্ষণে পরিণত হইল। বুঝিলাম ব্যাপার কিছু গুরুতর; কারণ প্রসন্নকে শরতের নির্জ্জলা লঘু মেঘের মতো গর্জ্জন করিতেই শুনিয়াছি, বর্ষণ করিতে দেখি নাই। আর সে মেয়ে গর্জ্জনেই কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিয়াছে, শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগের তা'র কখনও প্রয়োজন হয় নাই। আজ তাহাকে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল—বল কি গো, তুমি আমার রাগও বুঝনা, দুঃখও বুঝনা? আমাকে আঁটকুড়ী বলিয়া গাল দিল তা'ও বুঝনা? কেবল আফিং বুঝ আর মৌতাত বুঝ বুঝি?

আমি। তা বুঝি বৈ কি; মিথ্যা বলি কেমন করে'। কিন্তু কি জান, হুকুমে রাগও হয় না, অনুরাগও হয় না। তুমি ক্রোধে অধীর হয়েছ বলে' কি আমিও তোমার মতো লাফাব।

প্রসন্ন। তা'ত বটেই, আমাকে আঁটকুড়ী না বলে' তোমাকে আঁটকুড়ো বলত যদি ত দেখতাম।

আমি। বলতই যদি, তুমি মনে কর কি আমি অমনি তোমার মত ধেই ধেই করতুম? আচ্ছা আমাকে বল দেখি—তোমার ক'টি ছেলে?

প্রসন্ন। একটিও না।

আমি। ক'টি মেয়ে?

প্রসন্ন কর্কশ কণ্ঠে বলিল—একটিও না—তা বলে' কি আবাগীরা আমাকে আঁটকুড়ী বলবে? ছেলে-মেয়ে হওয়া না-হওয়া কি মানুষের হাত?

আমি। হাত যারই হ'ক, হয়নি যখন তখন হয়েছে বলা ত আর চলে না? তোমাকে কেউ যদি পুত্রবতী, জেয়ঁচ বলে—সেটা তুমি গালি বলে' না নিলেও বিদ্রূপ বলে' নিতে ত? বিদ্রূপ ত গালাগালিরই ছোট ভাই। সেইটাই বা কি করে' সহ্য করতে?

প্রসন্ন। তাই বা বলবে কেন?

আমি। তবে কি বলবে? ছেলে হয়েছে ত বলবে না, হয়নিও বলবে না! তোমার একটা স্বরূপ বর্ণনা ত আছে?

প্রসন্ন। তুমি যেমন হ্যাকা! ছেলে হয়নি আর আঁটকুড়ী বুঝি এক কথা?

আমি। ঠিক এক কথা নয় বটে; হয়নি বলে' তুমি যেন একটু ছোট, যেন একটু অপরাধিনী, অভাগিনী; আর যিনি বলেচেন, তাঁর ছেলে হয়েছে বলে' তিনি একটু বড়, একটু ভাগ্যবতী, এইটে যেন তিনি তোমাকে স্পষ্ট করে' বুঝিয়ে বলেচেন, এইত? কিন্তু গোড়াকার কথাটা ত সত্য?

প্রসন্ন। সত্যি হলেই বুঝি সব হ'ল? বলার কি একটা ধরণ নেই?

আমি। ধরণ আছে বৈ কি? কিন্তু ধরণটা চাঁচাছোলা করবার জন্যে ত আর সত্যটাকে ডুবিয়ে দেওয়া চলে না।

প্রসন্ন। তা বলে' কানাকে কানা, আর খোঁড়াকে খোঁড়া বলে' তাদের মনে কষ্ট দেওয়া বুঝি তোমার শাস্ত্র?

আমি। না তা নয়, খোঁড়াকে দেখলেই—ওরে খোঁড়া, আর কানাকে দেখলেই—ওরে কানা বলে' সম্বোধন করতে হবে, তা বলচি না; কিন্তু তাদের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ধরণের খাতিরে কানাকে ত পদ্মলোচন, আর খোঁড়াকে গিরিলঙ্ঘনকারী বলা চলে না। সেটা বিদ্রূপও বটে অসত্যও বটে।

প্রসন্ন। তা বলে' কাটখোট্টার মত কেবল লোকের বুকের উপর দিয়ে চাবুক চালালেই বড় বাহাদুরী হয়, না? লোকে চোয়াড় বলবে না?

আমি। হয়ত বলবে। কিন্তু লোকে যদি বিচার করে' দেখে ত দেখবে, সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত দুনিয়া বিনীতদের হাতে যত ঠকেচে চোয়াড়দের হাতে তা'র সিকির সিকিও ঠকে নি, চোয়াড়দের চিনতে, তাদের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে, আবশ্যক হ'লে তা হ'তে আত্মরক্ষা করতে, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না; কিন্তু বিনীতের মোলামত্বের অতলস্পর্শ ভেদ করতে গিয়ে অধিকাংশ সময়েই হাবুডুবু খেতে হয়, অনেক সময়ে তলিয়ে যেতে হয়। আমি বিনীতদের বড় ভয় করি—তারা বিনয়ের chloroform দিয়ে আমার

কোন মর্ম্মস্থলে ছুরিখানি বেমালুম চালিয়ে দিয়ে বসবে, আমি জানতেও পারব না। সরলতাই যাদের বিনয়, তাদের কথা বলছি না। সাধারণতঃ বিনয় মানে, সবটা না-বলা বা বিষম ঘুরিয়ে বলা; কোদালকে "মৃত্তিকা-খনন-যোগ্য-যন্ত্র-বিশেষঃ" না বলে' "কোদাল ইতি ভাষা" বল্লেই সর্ব্বনাশ। মনুষ্য-প্রকৃতির সহ্য করবার দিক দিয়ে দেখলে, indirect ও direct taxationএ যে প্রভেদ, বিনয় ও স্পষ্টবাদিতায়ও তাই। Direct taxএর সূচী বেধ মানুষ সহ্য করবে না, পরন্তু indirect taxএর সমগ্র ফালটা চলে' গেলেও টুঁ শব্দ করবে না। তেমনি একবিন্দু সত্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হ'লে মানুষ শিউরে উঠবে, কিন্তু একজালা মিথ্যা বিনয়ের শর্করা মিশ্রিত হ'লে চিনির পানা বলে' সমস্তটাই পান করে' ফেলবে।

প্রসন্ন একেবারে নিস্তব্ধ। আমি বলিলাম—প্রসন্ন, আঁটকুড়ী বলেছে বলে' তোমার গায়ে ঝাল লেগেছে কেন জান? কথাটা সত্য বলে'; তবে অপ্রিয় সত্য। কিন্তু সত্যের চেয়ে অপ্রিয় কিছু আছে কি? সত্য বল্‌তে অপ্রিয়, সত্য শুনতে অপ্রিয়; 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'—এ উপদেশ যদি মানতে হয়, ত সত্য বলাই হয় না। করুণা যে করে, আর করুণা যে পায়, উভয়ে ধন্য হয় সে কেবল এ সংসার দুঃখের সংসার বলে'। তেমনি, সত্য যে বলে, আর যে শোনে, বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই কষ্ট পায়—সে কেবল এ দুনিয়া মিথ্যার রাজ্য বলে'; এই মিথ্যার রাজ্যে তাই আদবকায়দার দরকার, সত্যরূপ কুইনাইনপিলকে আদবকায়দার শর্করাপ্রলেপ দিয়ে চালিয়ে দেবার জন্য। আমার ধারণা প্রকৃত সত্যরাজ্যে অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যে,

etiquette বলে' কিছু নেই, আদবকায়দা বলে' কিছুর প্রয়োজনই নেই। সেখানে কায়মনোবাক্যে দেবতারা সত্য ভিন্ন আর কিছুর আদানপ্রদান করে না। তাঁরা সত্য বলেন, সত্য শ্রবণ করেন, সত্য মনন করেন, সত্যকে ধারণ করতে পারেন ; তাঁদের আদবকায়দা বলে' যদি কিছু থাকে তাহাও সত্য ; একটা অবগুণ্ঠন নয়. আবরণ নয়। আর মানুষ সত্যের অনাবৃত জ্যোতি বরদাস্ত করতে পারে না বলে' একটু আদবকায়দার কুজ্ঝটিকায় ঢেকে তা'র প্রখর রশ্মিজালকে সংহত ম্লান করে' তাদের ক্লিন্ন হৃদয় ফলকের উপযুক্ত করে' নেয়। সত্যের প্রকট উজ্জ্বল আলোক সহ্য করবার অক্ষমতাই আদবকায়দার আকাঙ্ক্ষাকে সৃজন করেছে।

প্রসন্ন তখনও নিস্তব্ধ।

আমি বলিলাম—রমণি তোমার বক্ষে হাত দিয়ে দেখ, তথায় যে অমৃতের উৎস তোমার যৌবনের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত পরিপুষ্ট হ'য়ে সন্তানের আগমন প্রতীক্ষা করেছিল, সন্তানের কুসুমকোমল ওষ্ঠপুটে সংলগ্ন হয়ে সে অমৃতধারা যে তা'র শোণিত প্রবাহ পরিপুষ্ট করে নি, তা'তে কি তোমার নারীজীবন ব্যর্থ হ'য়ে যায় নি ? প্রকৃতি তোমাকে নারী করেছিল কেন ? পুরুষ বা নপুংসক করে' নি কেন ? তুমি সন্তান ধারণ করবে, পালন করবে, পরিপোষণ করবে. এইজন্য। প্রকৃতি তোমাকে তাঁর সৃষ্টিরক্ষার যন্ত্র হিসাবে সৃজন করেছিলেন। তারপর, সমাজ তোমাকে না-হয় গোপজাতি, অমুকের কন্যা, অমুকের পত্নী করেছে ; কিন্তু তুমি যে-জাতিই হও, যারই কন্যা হও, যারই পত্নী হও বা কারো পত্নী না-হও, তুমি মাতা

হবার জন্যই রমণী হয়েছিলে; আর তোমার জন্মের মৌলিক উদ্দেশ্য তোমা হ'তে সাধিত হয় নি বলে', ভাল শুনাক আর নাই শুনাক, সত্য সত্যই তুমি প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে' আজ আঁটকুড়ী!

প্রসন্ন এতক্ষণে মুখ খুলিল, কেননা, আঁটকুড়ী কথাটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না।

প্রসন্ন। মেয়েমানুষকে বিয়েই করতে হবে, আর ছেলে বিয়োতেই হবে, তারই বা মানে কি?

আমি। প্রসন্ন, আমার মত বুড়ো ভূশুণ্ডীকে আর ও-প্রশ্ন কর' না; অর্ব্বাচীনদের ও হেঁয়ালি বলে' ধাঁধা লাগাতে চেষ্টা কর'। সাত পাক দিয়ে বিয়ে করতে হবে কি না হবে, সেটা সমাজ বুঝবেন; কিন্তু মেয়েমানুষকে বিয়ে করতেই হবে—তা সাত পাকেই হ'ক, বিনি পাকেই হ'ক, আর বিপাকেই হ'ক। আর যতদিন পুরুষের ঊরুদেশ ভেদ করে' সন্তানের জন্ম, ও তর্জ্জনী হ'তে দুগ্ধক্ষরণ উপন্যাসের পৃষ্ঠা হ'তে নেমে এসে এই বাস্তবজগতে সত্য হ'য়ে না উঠবে, ততদিন মেয়েমানুষকে ছেলে বিয়োতেই হবে, আর ওটা একমাত্র তাদেরই কৃত্য মধ্যে পরিগণিত থাকবে।

প্রসন্নর চোখ তখন আবার জলে ভরিয়া উঠিল।

সে বলিল—তবে কি যার ছেলে হ'ল না সে একেবারে দুনিয়ার বার হ'য়ে গেল? অনেক পুত্রহীনা কত সদাব্রত, কত দেউল, কত পুষ্করিণী করে' দিয়েছে, তা'তে কি লোকের উপকার হয় নি? কত পুত্রহীনা নারী ধর্ম্মের পথে, লোকহিতের পথে, কত কীর্ত্তি রেখে গেছে সেগুলা কি অপুত্রক বলে' ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়?

আমি। তা কেন? এই তুমি, আঁটকুড়ী হয়েও বা হয়েচ বলেই, এই যে নিরালম্ব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করছ, তা'তে কি আমার উপকার হচ্ছে না, না তোমারই পুণ্য সঞ্চয় হচ্ছে না। যদি ক্বচিৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে—আমার এই দিগন্ত বিস্তৃত বিদগ্ধ জীবন-মরুপ্রান্তরে তুমি যে ফলহীন রসাল, একক আমার মাথার উপর রৌদ্রে শিশিরে পল্লবাস্তরণ বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তার কি মূল্য নাই? কিন্তু গাছে যখন ফল ধরে নি, তখন তার বৃক্ষ-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অপূর্ণ থেকে গেছে, তা'ত বলতেই হবে। এখন গাছটাকে কেটে চেলাকাঠ করলেও হয়ত, কুমারের হাঁড়ি পুড়বে, ভাত সিদ্ধ হবে, চিতা জ্বলবে, একটা-না-একটা কাজে লাগবেই, কিন্তু তা'তে আম্রফলের রসাস্বাদ মিলবে কি?

নারীর অনেক কীর্ত্তি আছে, সেগুলা পুরুষের হলেও বিশেষ প্রভেদ হ'ত না। কিন্তু সুসন্তান প্রসব করে' তা'কে লালনপালন করে' নারী তা'কে মানুষ করে' তুলল, সে কীর্ত্তি তা'র একদিকে যেমন ভগবৎ প্রেরণা সম্পূর্ণ করল, অন্যদিকে তার নারীজীবনও সার্থক হ'ল। এর মত নারীর কৃত্য ও কীর্ত্তি আর কিছুই নাই।

প্রসন্ন মুখখানা তোলো হাঁড়ির মত করে' উঠে গেল; তারপর আমার সঙ্গে সে তিনদিন কথা কয় নি, কিন্তু ঠিক সময়ে দুধ দিয়ে যেত, একটি মিনিট এদিক ওদিক হত না।

৬

সেবা

কামধেনু সংস্কৃতভাষার দৌলতে বাক্ ও অর্থের মধ্যে কোন নিত্য সম্পর্ক নাই ; কুলীন ব্রাহ্মণের বহুপত্নীর ন্যায় এক কথার বহু অর্থ। সুবিধামত যে কোন একটার সহিত কথাটা যোজনা করিয়া দেওয়া চলে। তবে উভয়ত্রই অর্থসঙ্গতির অভাব ঘটিলেও তর্ক কচ্‌কচির অভাব হয় না।

সেবা অর্থে পরের সেবাও বুঝায়, নিজের সেবাও বুঝাইতে পারে। ঠাকুরের সেবা অর্থে ঠাকুর ও পুরোহিতের উভয়ের সেবাই বুঝায় ; অর্থাৎ খাওয়া ও খাওয়ান দুই বুঝাইতে পারে এবং কার্য্যতঃ দুইই বুঝাইয়া থাকে।

প্রসন্নর বাড়ী দুর্গা প্রতিমা হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর সব ঠাকুরই লোকে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। নিঃসন্তান প্রসন্ন কার্ত্তিকেয়ের সেবা করিয়া ধন্য হইবে, এইজন্য পাড়ার লোকের ঘুম হয় নাই ; তাই তাহারা বৎসরের শেষ ঠাকুরখানিও ফেলিতে ভুলে নাই। প্রসন্ন করিবে সুব্রহ্মণ্যের সেবা, আর গ্রামের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলে সেবা লইবেন, ইহাই যে সেবার নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তাহা

কাহারও অবিদিত ছিল না। যাহা হউক বলিহারি বোকা গয়লার মেয়েকে! সে সেই সব-প্রথম ঠাকুর ফেলার বেলা একটু যা শিহরিয়া উঠিয়াছিল, তারপর বারবার এ উৎপাতে সে একেবারেই বিচলিত হয় নাই। ফেলা-ঠাকুরের পূজা যেন তাহার কৌলিক প্রথাই হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রত্যেক পূজাটাই সে খুব সমারোহের সহিত করিয়াছিল; গ্রামসুদ্ধ লোককে ভূরিভোজনে পরিতুষ্ট করিয়াছিল। হঠাৎ তাহার কষ্টার্জ্জিত পয়সার প্রতি সে কি জন্য এত নির্ম্মম হইয়া উঠিল তাহা বুঝা গেল না; তবে ইহা বেশ বুঝা গেল সে যে ঠিক কত পয়সার মালিক চোরেও তা'র সন্ধান পায় নাই, নতুবা এই ঘোরান উপায়ে তাহার সৎকার করাইতে হইত না।

কিন্তু এত করিয়াও পাড়ার লোকে প্রসন্নকে নিশ্চিন্ত হইতে দিল না। যে সকল ষণ্ডামার্ক যুবকের দল তাহার প্রতিমা পূজায় সহায়তা করিয়াছিল—মেরাপ বাঁধিয়া, তালপাতার ঘর করিয়া দিয়া, রন্ধন পরিবেশন ইত্যাদি ভূতের মত, রাত নাই দিন নাই, খাটিয়া ঠাকুর-সেবার সহায়তা করিয়াছিল—তাহারা এখনও প্রসন্নকে ছাড়ে না—বলে, তাহাদের একদিন ভাল করিয়া না সেবা লইলে তাহার সব পূজা পণ্ড, পাঠ পণ্ড, লোক-সেবা পণ্ড; যেহেতু তাহারা না থাকিলে তাহার এত করিত কে?

মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি, অর্থাৎ স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত নয়। অতএব আমি আফিংএর মৌতাতেই থাকি আর সজ্ঞানেই থাকি, আর আমার দ্বারা তাহার পরিত্রাণ সম্ভব হউক আর না হউক, প্রসন্নর মাথা আটকাইলেই আমার কাছে ছুটিয়া আসিবেই আসিবে। তাই

দুধ দিবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তাহাকে আসিতে দেখিলেই আমি বুঝিতাম—প্রসন্নর মাথা আটকাইয়াছে।

ঠিক-দুপুর বেলা প্রসন্ন এক পাল পাড়ার ছেলে লইয়া আমার উঠানে আসিয়া উপস্থিত।—ব্যাপার কি?

প্রসন্ন। আর ব্যাপার কি—আমাকে ত ছিঁড়ে খেলে। দে: যদি উপায় করতে পার।

প্রসন্ন এই বলিয়া আমার দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল।

১ম যুবা। ব্যাপার আর কি ঠাকুর মহাশয়! মাসী গ্রামসুদ্ধ লোকের সেবা নিল, আর আমাদের সেবা নিতেই যত আপত্তি!

আমি। কেন বাপ-সকল তোমরা কি সেবা নাও নি? তোমরা কি না-খেয়ে প্রসন্নকে অব্যাহতি দিয়েছ?

২য় যুবা। আমরা যা করেছি তা'র কি মূল্য আছে? উঠান চাঁচা থেকে আরম্ভ করে' ঠাকুর ঘাড়ে করে' বিসর্জ্জন দেওয়া পর্য্যন্ত, আমরা কি না করেছি? আর তা একবার নয়! গ্রামসুদ্ধ লোকজনের পরিচর্য্যা করা কি মুখের কথা? রাতকে রাত দিনকে দিন জ্ঞান না করে' আমরা যে বুক দিয়ে এত করলুম তা'র কি পুরস্কার নেই?

আমি। উঠান চাঁচা থেকে কেন বাপধন, উঠান চষা থেকেই বল না? নাটের গুরু ত তোমরাই। ঠাকুরগুলো পর পর তোমরাই ত ফেলেছিলে?

৩য় যুবা। বলুন দেখি—এই উপায়ে গ্রামসুদ্ধ লোকের মধ্যে কি রকম সাড়া পড়ে' গেছে! গয়লার বাড়ী গ্রামসুদ্ধ লোকের

সমাবেশ এ কি অন্য উপায়ে সম্ভব হ'ত? এ ডেমোক্রেটিক যুগ। আমরা এই নীচের দিক থেকে thin end of the wedge মিষ্টান্নের সঙ্গে প্রবিষ্ট করে' দিলুম। দেখুন এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। আমরা ভিতর থেকে সমাজের পরিবর্ত্তন চাই। বাইরের আমদানী করা Reform আর পরগাছা দুই সমান।

আমি। ডেমোক্রেটিক যুগ না বলে' মিষ্টান্নের যুগ বল্লে, বোধ হয় আরও ঠিক হ'ত। যেহেতু গ্রামের লোক ডেমোক্রেসী খেতে আসে নি, মিষ্টান্ন খেতেই এসেছিল।

৩য়। আপনি বিষয়টাকে একেবারেই বুঝতে পারচেন না। যার জন্যেই আসুক, এসেছিল তো? আর দেখুন, আমাদের গ্রামের যুবকদলের কি শিক্ষাই না এ হ'তে হয়েছে। প্রথম, গ্রামের কা'কে ক'টি ছাঁদা দিতে হবে, কা'কে কি উপায়ে পরিতুষ্ট করতে হবে, কে ক'টা রসগোল্লা খেতে পারে, কে ক'দিস্তা লুচি খেতে পারে—এ সকল হাঁড়ির খবর পাবার অবসর কি ছাড়া যায়? তারপর, কার্য্যপটুতা লাভের এমন অবসর কোথায়? কা'র পর কি দিতে হয়, কতখানি দিতে হয়, সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে, কৃতিও অপদস্থ না হয় আবার ভোক্তারাও না বুভুক্ষিত র'য়ে যায়—এ সকল বিষয়ে পটুতা লাভের অন্য উপায় কোথায়?

আমি। বাপু! যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। গ্রামসুদ্ধ লোক মিষ্টান্ন খেতে এসেছিল। মিষ্টান্ন খেয়ে ঘরে গেছে। তোমাদের পরিবেশনের গুণে হয়ত কেউ কম বা কেউ বেশী পায় নি; কিন্তু তা থেকে মিষ্টান্ন-ভোজন-রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধি ছাড়া যে আর

কোনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে তা আমি মনে করি না।

১ম যুবা। যাই হ'ক। প্রসন্ন মাসি যখন এত করলে, আর আমাদের সেবা নিতেই তা'র যত কষ্ট! এ বড় অন্যায়।

২য় যুবা। আমরা এত পরিশ্রম করলুম তা'র বুঝি দাম নেই?

৩য় যুবা। না-না, আমরা দাম হিসাবে কিছুই চাইছি না। আমরা যে লোকশিক্ষা আর দেশ (আমাদের গ্রামটাই দেশ) সেবার এই ব্যবস্থা করলুম, সেটা কি প্রকাশ্য ভাবে,—পৃথক করে'— পরিস্ফুট করে' স্বীকার করা উচিত নয়?

প্রসন্ন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। আমি বলিলাম—সেবাকার্য্যের সবটাই তোমরা করেছ—এই তো তোমাদের কথা? কিন্তু মনে কর, প্রসন্ন যদি প্রথম খড়-জড়ান মূর্ত্তিটা উনানের ভিতর দিত, তা হ'লে তোমাদের দেশসেবার অবসর কোথা থাকত বাপু? প্রসন্ন যদি তা'র মুখে-রক্ত-ওঠা পয়সা একটিও না ছাড়ত, তা হ'লে শুধু উঠান চেঁচে, সেই উঠানে উপবিষ্ট অতিথির মুখে সবুজ ঘাস আর মাটির ডেলা ভিন্ন কি দিতে বাপু? গয়লার মেয়ের কি সুবুদ্ধিটা তোমরা দিয়েছিলে? তা'র মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলে একটি একটি করে' রোজকার করা টাকা যদি জলের মত সে ঢেলে না দিত, তবে তোমরা সুধুহাতে অষ্টরম্ভা ছাড়া আর কি কা'কে খাওয়াতে বাপু? আর দেশের লোকের সঙ্গে কি পরিচয়ই হ'ত বাপু হে? অতএব পরিস্ফুট করে' যদি কিছু স্বীকার করতে হয়, তবে আগে স্বীকার কর— প্রসন্নর হৃদয়, প্রসন্নর অর্থদান, প্রসন্নর ত্যাগ। তারপর পরিবেশন ও পরিচর্য্যার কথা তুলো। সেটা

ভাড়াটে র্‌াঁধুনি বামুনের দ্বারাও হ'ত। একজন কেবল পাকা ভাণ্ডারীর ওয়াস্তা বৈ তো নয়? আর হাঁড়ির খবর নিতে যদি সত্য সত্যই ব্যগ্র হ'য়ে থাক, তা হ'লে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে ত সে কাজ করতে পার। তা'র জন্য ত বাবা, এত উঠান চাঁচার দরকার নেই— অত জল বেড়াবেড়ি করবার দরকার নেই।

তরুণ যুবা। আপনি বলেন কি? ভাড়াটে লোক দিয়ে দেশসেবা? Horror of horrors!

আমি। কেন বাপধন, এ কি খেলা না মজলিস, যে প্রফেসনালের গায়ে গা ঠেকলে অ্যামেচারের মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে? না, খাঁ সাহেব পেশাদার গাইয়ে বলে' নিধুবাবুর আর সে আসরে হাঁ করতে নেই? যদি দেশসেবাই সত্যিকারের অভিপ্রায় হয় ত তা'র ভেতর আবার এ নূতন জাতবিচার, আর এ নূতন ছুঁৎমার্গ কেন?

তরুণ যুবা। খেলা বা আমোদ নয় বলেই ত আমরা ভাড়াটে লোকের নামে খড়্গহস্ত হচ্চি। এ দেশসেবা— দেশের কাজ। যদি মজুরিই নিলুম ত কি হ'ল?

আমি। কাজটা ক্ষুদ্র ও সাময়িক বলেই হয়ত সামলাতে পেরেচ। মনে কর, দেশ বলতে তোমার গ্রামখানি না হ'য়ে যদি সত্যি সত্যিই সমগ্র দেশটাই হত, তাহ'লে কি যাদের ভাড়াটে বলে' নাক শিটকে উঠছ, তাদের সাহায্য না নিয়ে চলত? ইউরোপের এই যে এত বড় যুদ্ধটা হ'য়ে গেল, অবৈতনিক (ভলান্টিয়ার) যোদ্ধা নিয়ে যদি লড়তে হ'ত, তাহ'লে যুদ্ধ ফতে না হ'য়ে, দেশটাই ফতে

হ'ত না কি ? আর সৈনিকেরা বেতন নিয়ে যুদ্ধ করেছে বলে' কি তাদের জান দিতে যাওয়াটা দেশহিতৈষণাই নয় ? না, সে দেশ-হিতৈষণা তোমার দেশহিতৈষণার চেয়ে মর্য্যাদায় কম বলতে হবে ?

ছেলেগুলা মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেল। আমার কানে যেন আসিল—বুড়া সেকেলে ফসিল (fossil), এ যুগের ধর্ম্ম কি বুঝবে ?

প্রসন্ন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কে জানে, আমার ভয় করছে। ছেলেগুলো আমার ঘরে আগুন দেবে না ত ! এত খরচ হ'ল – না-হয় ও-কটাকে একটা ভোজ দিলেই হ'ত।

৭

অহিফেন ব্রত

মগধ বা মালবের মাঠে আফিমের ক্ষেত যে দেখে নাই সে বৃথাই জন্মেছে বলব না ত কি? লাল, নীল, সাদা—রেশমের ফুলের মত ফুল মাঠ আলো করে' আছে; ফুলে ফুলে পালে পালে মৌনাছি সর্ব্বগায়ে পরাগ মেখে ফুলের বুকে লুটোপুটি খাচ্ছে; ক্ষণেক পরে ফুলের পাপড়ীগুলি ঝরে পড়ল; আর অমৃতের আধার আফিমের ফলগুলি মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল; তারপর, বলিহারি মানুষের বুদ্ধি! স্থচের ডগায় বিদ্ধ হ'য়ে সে অমৃতের উৎস খুলে গেল, আফিমের জন্ম হল।

স্বর্গে ছিল অহিফেন
মর্ত্ত্যে আনিল কে?

সে প্রাতঃস্মরণীয় দেবদূতের নাম পুরাণে পাওয়া যায় না; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস—অহিংসা আর আফিম একই সময়ে একই মহাপুরুষের দ্বারা স্বর্গরাজ্য থেকে মর্ত্ত্যে আনীত হয়েছিল। কারণ আফিমের সঙ্গে অহিংসার নিত্য সম্বন্ধ; যেখানে সত্যিকারের অহিংসা আছে, খোঁজ করলে জানবে, সেখানে অল্পবিস্তর আফিমের

আমেজ আছেই আছে; আর যেখানে আফিম আছে—সেখানে অহিংসা থাকতে বাধ্য।

আফিমের যে কি শক্তি তা আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় গভর্ণমেণ্ট বেশ জানেন; আসাম তরাইএর দুর্দ্দান্ত নাগা কুকী প্রভৃতি জংলা-গুলোকে, বৎসর বৎসর আফিম সওগাৎ দিয়ে, বেশ শান্ত শিষ্ট করে' রেখেছেন; তাদের পশুবুদ্ধি গিয়ে তা'রা লক্ষ্মী হ'য়ে আফিম খাচ্ছে আর ঝিমুচ্ছে। পঞ্জাব সীমান্তে পাঠানগুলোকে এখনও আফিম ধরাতে পারেন নি বলে', তা'রা সেই ইতিহাসের অরুণোদয়ের সময় যে পশুবৎ ছিল এখনও তাই আছে; ছোট্ট ছোট্ট আফিমের গুলিতে যে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হ'ত, বড় বড় কামানের গোলাতে তা হচ্চে না; তা'রা যে-জংলী সেই-জংলীই র'য়ে গেছে। ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত ভারতবর্ষীয় মেষের পালের উপর পড়ে' তা'রা নিয়তই হাঙ্গামা বাধাচ্চে। চীনেরা যতদিন বেশ নির্ব্বিবাদে আফিম সেবন কচ্ছিল ততদিন কেমন নির্ব্বিবাদে সুড় সুড় করে' সব ইউরোপীয় পাদরী, ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' ইউরোপীয় বণিকসঙ্ঘ চীনের সমুদ্রতীরে, চীনের main artery ইয়াংসি নদীর উভয় পার্শ্বে, ভাল ভাল জায়গাগুলি দখল করে' বসবার অবসর পেয়েছিলেন; কেন না তখন চীন ছিল অহিংস ও অহিফেনসেবী। এখন চীন আফিং কিছু কম খাচ্চে ও সেই সঙ্গে কিছু কম অহিংস হ'য়ে উঠেছে; Boxer rebellion থেকে সুরু করে' হিংসা বেড়েই চলেছে—foreign devilগুলোকে আমল দিতে বড় রাজী হচ্চে না।

কিন্তু গোড়ায় গলদ হ'য়ে গেছে! এমন নির্ব্বিরোধী মোলায়েম

জিনিষটার কিনা নাম রাখা হ'ল—অহিফেন। নামে কি এসে যায় যে বলে, সে নাম-রূপের গূঢ় মাহাত্ম্য ছাইও বোঝে না। What is in a name; a rose under another name will smell as sweet—এটা অর্ব্বাচিনের কথা, অরসিকের কথা। তা যদি হ'ত তা হ'লে—চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে মুখুয্যে সব এক কথা হ'ত, বামুন শূদ্র এক হ'ত, কুলীন মৌলিক এক হ'ত—"বস্তুগত্যা" ত সব সেই মাতৃজঠরে দশমাস দশদিন যাপন, তারপর সুখ-দুঃখের দোলায় কিছুদিন দোল খাওয়া, অবশেষে বোড়াইচণ্ডীর ঘাটে একমুষ্টি ছাই। না, নামের মাহাত্ম্য মানতেই হবে; প্রসন্নকে আর কোন নামে অভিহিত করলে প্রসন্ন ত সাড়া দেবেই না, প্রসন্নকে যে জানে তা'র মনও সাড়া দেবে না, অন্য নাম প্রসন্নকে মানাবেই না। তা না হ'লে হিন্দুশাস্ত্রে নাম করণের এত পাকাপাকি ব্যবস্থা কেন? সে যাহোক, এমন মোলায়েম জিনিষটাকে যদি একটু মোলায়েম করে' বলা গেল, আফিম—তা'তে কি বৈয়াকরণের হাত এড়াবার যো আছে? সে ব্যক্তি ষষ্ঠীতৎপুরুষ প্রকরণ বার করে' বলবেনই—অহিঃ কিনা বিষধরঃ তস্য ফেনঃ। কি উগ্র, কি প্রচণ্ড, তীব্র নাম! এই নামের দোষেই এমন পরম পদার্থের এত অনাদর, তাই লোকে এমন শান্ত শিষ্ট জিনিষটাকে আজ বিষনয়নে দেখে।

আমি কিন্তু সকলকে একবার ধীরচিত্তে আফিমের বিচার করতে অনুরোধ করি, কারণ ন্যায়বিচার সকলেরই প্রাপ্য। সে প্রাপ্য অধিকার থেকে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গম কেহই

বঞ্চিত নয়, আফিমই বা বঞ্চিত হবে কেন? তবে ন্যায়বিচার করা সকলের অধিকার নয়; এইখানেই যা গোল; কেন না যার আফিমে অধিকার নেই, সে তার ভালমন্দ বিচার করবে কোন অধিকারে? তারপর বিচারই বা হবে কি উপায়ে? চিনি যে মিষ্টি তা কি ন্যায়ের কচকচি দিয়ে বোঝা যায়, না বোঝান যায়। একথাবা চিনি গালে ফেলে দিলেই সব গোলমাল মিটে যায়? আফিম সম্বন্ধেই বা অন্য পন্থা হবে কেন?

অতএব বৈয়াকরণ মাথায় থাকুন, আপনারা একবার ন্যায়ের খাতিরে একটু একটু আফিম বদনে দিয়ে দেখুন। এই human test tubeএর ভিতর আফিমকে ফেলে একবার পরীক্ষা করুন; অহিফেন মাহাত্ম্য চূড়ান্তরূপে অবধারিত হ'য়ে যাবে। বিশেষতঃ বর্ত্তমানযুগে আমরা non-violent non-co-operation আমাদের জীবনের, অন্ততঃ রাজনীতিক জীবনের, মূলমন্ত্র করেচি। এ মন্ত্রকে সার্থক করার প্রতি অহিফেনের যে কতখানি শক্তি তা একবার প্রত্যক্ষ করুন, এক কাজে দুই কাজ হ'য়ে যাবে।

বর্ত্তমান movementএ আফিম কতটা কাজে লাগতে পারে তা কেউ ভাল করে' ভেবে দেখে নি, আমি দেখিচি। আফিংএর সঙ্গে non-violence বা অহিংসার যে নিত্য-সম্বন্ধ তা পূর্ব্বে বলিচি; তারপর আফিমের সেবায় non-co-operationএরও খুব সুবিধা হ'তে পারে। একটু বেশীদিন এ দিব্যবস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'লে, আফিম ছাড়া দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর সঙ্গে non-co-operation করতেই হবে, bureaucracy ত কোন্ ছার! এবং দেশের লোক

শ্রদ্ধাবান হ'য়ে যদি এই নিরুপদ্রব অহিফেন সেবায় মন দেয়, তা হ'লে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে স্বরাজলাভ অবধারিত। ছেলেবুড়ো, বিশেষ করে' বাবাজীবনেরা, যদি এক মনে এক প্রাণে অহিফেন ব্রত গ্রহণ করে, তবে আমি কমলকান্ত চক্রবর্ত্তী বলে' দিচ্ছি—৩১এ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজলাভ ঘটবেই ঘটবে, অন্যথা দিন পিছিয়ে দিতে হবে, আমি তজ্জন্য দায়ী থাকব না।

আর জাতিবিচার বা ছুৎমার্গ—এসব যে কোথায় তলিয়ে যাবে ডুবুরি নাবিয়ে তা'র খোঁজ পাওয়া যাবে না। তা'র আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্চি। আমি একবার রেলে চড়ে' নসিরামবাবুর দেশে পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম। আমার পূজার নিমন্ত্রণ অর্থে অহিফেনের ভূরি সেবনের নিমন্ত্রণ; কেননা মৌতাতী লোকের শক্তিপূজার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকতে পারে না। আমার সঙ্গে আমার দপ্তর, আর দপ্তরের ভিতর আমার আফিমের কৌটাটা; ষ্টেশনে যখন গাড়িখানা দাঁড়াল, আমার ঠিক খেয়াল ছিল না; যখন গাড়িটা ছাড় ছাড়, আমার সংজ্ঞা হ'ল, আমি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। গাড়িখানা চলে গেলে, আমার হাতটা খালি খালি বোধ হ'তে লাগল; তখন মনে করে' দেখি, আমার আফিমের কৌটা-সমেত দপ্তরখানা গাড়িতে রয়ে গেছে! বলা বাহুল্য আমার দপ্তরের জন্য মোটেই দুঃখ হ'ল না, যেহেতু যে-মাথা থেকে দপ্তরের লেখা বাহির হ'য়ে ছিল তা আমার স্কন্ধেই ছিল। কিন্তু আফিমের কৌটার জন্য আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! আমার তখন খোঁয়ারির সময় নয়, কিন্তু কৌটাটা হাতছাড়া হওয়ায়, আমার তখনই হাই

উঠতে লাগল। সে যে কি হাই উঠা, আর কত বড় হাই উঠা, তা যে অহিফেন সেবী নয়, সে বুঝতে পারবে না ; রাবণের রথ গেলবার জন্য জটায়ুও ততবড় হাঁ করে নি। আমি বড়ই বিপন্ন হ'য়ে পড়লাম। সে অজ পাড়াগাঁ, সেখানে কি দয়াময় সরকার বাহাদুর পাড়াগেঁয়ে ভূতেদের জন্য আফিমের দোকান খুলেচেন? কোথায় যাই, কি করি! এমন সময় এক নধর দাড়িযুক্ত মুসলমান ভদ্রলোক (যাঁর পূর্ব্বপুরুষ হয়ত, যে চতুর্দ্দশ অশ্বারোহী বক্তিয়ার খিলিজির সঙ্গে বাঙ্গালা জয় করে' ছিল, তাঁদেরই অন্যতম) আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। নব্য ঐতিহাসিক হয়ত চম্‌কে উঠে বলবেন—চোদ্দয় পদ্য মিলতে পারে, কিন্তু ১৪জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় হয় না ; আর বাঙ্গালার মুসলমান শতকরা ৯৯জন......। সে প্রশ্ন এখন তোলা থাক। কিন্তু মানুষটা কি মোলায়েম, কি নরম, ঠিক আফিমের মতনই নরম আর মোলায়েম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে, আমার 'আকর্ণ হাঁ' দেখে, যেন বড়ই ব্যথিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন—মহাশয় (তাঁর পূর্ব্বপুরুষ চতুর্দ্দশ অশ্বারোহীর অন্যতম, লক্ষণাবতীর রাজপথে ব্রাহ্মণ পথিককে ঠিক সে সুরে সম্বোধন করেন নি) আপনাকে কিছু বিপন্ন দেখচি, আপনার শরীর কি অসুস্থ?

আমি। অসুস্থ বলে'! একেবারে গত, মৃত!

মুসলমান। কেন বলুন দেখি?

আমি। ঐ দেখুন গাড়ি; (তখনও রুপি বাঁদরের পশ্চাদ্দেশের মত গাড়ির রক্তবর্ণ পশ্চাদ্ভাগ দূরে লি-লি কচ্ছিল) ঐ 'অদয় অক্রূরের' রথে আমার কালাচাঁদ, আমায় ফেলে কোন্ অজানা মথুরাপুরীর দিকে

চলে' যাচ্ছেন ; তাঁর বিরহদুঃখে আমি কৃষ্ণবিরহিনী রাধিকার মত মৃতপ্রায় হ'য়ে খাবি খাচ্চি !

মুসলমান। আমি তা বুঝেচি ; উঠুন, আমার সঙ্গে আসুন।

আমি। আজ্ঞে, আপনার কি আফিমের দোকান আছে ?

মুসলমান। আজ্ঞে না ; তবে আমিও মৌতাতী লোক, আপনাকে দেখেই চিনেছি—বলেই তিনি হাই তুলে, দু'টা তুড়ি দিয়ে মুখবিবর বন্ধ কল্লেন। আমিও চিনলুম !

এই হারুণ-অল-রসিদের সঙ্গে তাঁর দৌলতখানায় উপস্থিত হ'লে তিনি অতি যত্ন করে' রূপার কৌটায় আফিম, রূপার গোলাপপাশে তোফা গোলাপজল, আর এক রূপার পাত্র আনলেন। আমাকে বল্লেন—মহাশয় সেবা করুন। আমি গোলাপজলে আফিম গুলে (বলা বাহুল্য একটু বেশী মাত্রায়ই) পান করলুম। ধড়ে প্রাণ এল। খাঁ সাহেবও একমাত্রা সেবন করলেন।

এখন বল ত—গোলাপজলও যে জল আমার সে জ্ঞান হরণ করলে কে ? খাঁ সাহেবের সঙ্গে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কোন কৌলিক সম্পর্ক থাকতে পারে না, তবে এত আত্মীয়তাই বা কোথা থেকে এল ; খাঁটি বৈদিক আহার খেয়ে, খাঁ সাহেবের বকৃতিয়ারি মেজাজে এত কমনীয়তা কোথা থেকে এল ; সে এত ব্যথার ব্যথীই বা হ'ল কি করে' ? বলতেই হবে সব অহিফেন প্রসাদাৎ—এই অহিফেন প্রসাদাৎ—বাঘেগরুতে জল খাবে, তেলেজলে মিশবে, সাপেনেউলে সৌহার্দ্দ্য হবে, হিন্দুমুসলমান ভাই ভাই হবে ! অতএব অহিফেন সেবা গ্রহণ কর।

মৌতাত বেশ জমে এলে খাঁ সাহেবকে অভিবাদন করে', এবং একদিনের মত অহিফেন চাদরের খুঁটে "বন্ধনং কৃত্বা", আমি নসিরামবাবুর বাড়ী যাত্রা করলুম ; খাঁ সাহেব সদর দরজা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন ; অতি মোলায়েম ভাবে বল্লেন "গুণা নেবেন না, সেলাম"। আমি নমস্কার করে' মনে মনে বল্লাম, "অহিফেনো জয়তি।"

৮

"বাবা মেয়ে"

"সখি! নাহি জানন্থ সোহি পুরুষ কি নারী!" একথা কাবতায় বেশ শুনায়; কিন্তু পুরুষকেই বল আর রমণীকেই বল, বাস্তব-জীবনে, এ সন্দেহাভাষ অলঙ্কারের মধ্যে যে ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে, পুরুষ বা নারী তা বরদাস্ত করতে পারে না। পুরুষকে রমণী আর রমণীকে পুরুষ বল্লে, উভয়ের পক্ষেই ব্যাজস্তুতির বিপরীতই বুঝিয়ে থাকে। সোজা কথায়—মেয়েমুখো পুরুষ আর মদ্দা মেয়েমানুষ এ দুটা কথাই গালাগাল।

মানুষ অর্থাৎ পুরুষ মানুষ নারীকে, অবলা, দুর্ব্বলা, weaker vessel, ইত্যাদি উপাধি দিয়ে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু নারী, নারী হিসাবে, কোনদিনই অবলাও নয়, দুর্ব্বলাও নয়, weaker vessel'ও নয়। আমি প্রবলা, হরবোলা, হিড়িম্বা বহুত দেখেছি। তবে ও-সকল খেতাব যে নারীকে দেওয়া হয়েছে তা'র ভিতর একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে। পুরুষ নারীকে যা করতে চায় বা যেরূপ দেখতে চায় তদনুরূপ উপাধিই দিয়ে থাকে। 'নাই' বল্লে শুনেছি সাপের বিষও থাকে না। তোমার বল নাই, বুদ্ধি নাই, তেজ নাই ইত্যাদি শুনতে শুনতে নারী বাস্তবিকই অবলা, দুর্ব্বলা হ'য়ে যাবে

এই দুষ্ট অভিপ্রায়েই পুরুষ নারীকে ঐ সকল সুশোভন অভিধান দিয়ে থাকে। নারী প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই অবলা নয়।

তা বলে' নারী পুরুষও নয়, পুরুষের অসম্পূর্ণ সংস্করণও নয়। কবি বলেছেন—Woman is not undeveloped man, but other; ইহার বৈজ্ঞানিক হেতুবাদ যাহাই থাকুক, ব্যবহারিক জীবনে, খেয়ালের বশে খানিকটা এ সাংঘাতিক সত্যকে ভুললেও, কার্য্যতঃ এক মুহূর্ত্তও ভোলা চলে না। আর কবির উক্তির প্রতি-প্রসবটা, এ পর্য্যন্ত কোন কবি লিপিবদ্ধ না করলেও, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বলে' রাখলাম—Man is not developed woman, but other. ইহাই সহজ, অবিকৃত নৈসর্গিক অবস্থা।

মনু যাজ্ঞবল্ক্য হ'তে আরম্ভ করে' সেকলে পর্য্যন্ত সকল সংহিতা-কার অপরাধ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ বিভাগ করেন নি; চুরি, জুয়াচুরি, খুন, জখম ইত্যাদির শাস্তিবিধানের সময়, জুরীর মন সুন্দর মুখ দেখে টলবার সম্ভাবনা থাকলেও, সংহিতাকারের মনে স্ত্রী পুরুষ প্রভেদজ্ঞান ছিল না। স্ত্রী-চোর ও পুরুষ-চোরের একই শাসনের ব্যবস্থা করা হয়েচে। অবলা বলে' কোনই ইতরবিশেষ করা হয় নি। মানব-চরিত্র জ্ঞানের এমন পরিচয় কোন নিপুণ নাটককারের নাটকেও দেখতে পাই না। তবে স্ত্রী ও পুরুষের এমন একটা বয়স আসেই যখন উভয়েই অজহল্লিঙ্গ হ'য়ে যায়; যেমন আমি, আর প্রসন্ন। বৃদ্ধ কমলাকান্ত ঠিক শীতোষ্ণাদি দ্বৈতবিরহিত সাংখ্যোক্ত পুরুষ না হ'লেও তা'র প্রকৃতির একটা দিক একেবারে মুছে গেছে বল্লে মিথ্যা বলা হয় না; প্রসন্নরও তাই; প্রসন্নও একপ্রকার নিরুপাধি নিরবচ্ছিন্ন

মানুষমাত্র, স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়। এ অবস্থাটা নির্ব্বাণের পূর্ব্ব-সূচনামাত্র; মানুষ যে জন্মাবধি তিল তিল করে' মরে, এটা সেই মৃত্যুরই পূর্ব্বাভাষ মাত্র; তথাপি এটা স্বাভাবিক; বিকার হ'লেও অনৈসর্গিক নয়।

কিন্তু জীবন্ত পুরুষ আর জীবন্ত নারী দুইটা স্বতন্ত্র জীব; দুইটার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম; সে ধর্ম্ম যিনি স্ত্রীকে স্ত্রী করেচেন, পুরুষকে পুরুষ করেচেন তিনিই নির্ণয় করে' দিয়েচেন; তাদের শরীর মন সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের অনুযায়ী করে' গড়েচেন। নারী যদি পুরুষসুলভ গুণের বা কার্য্যের অধিকার চায়, সেটা নারীস্বভাবের বিকার বা অস্বাভাবিক পরিণতি বল্‌তেই হবে।

এদেশে পুরুষ চিরদিন রমণীকে মাতৃ-আখ্যা দিয়ে এসেছে, সেটা ঠিক নিছক courtesy নয়; কেননা স্ত্রীর স্ত্রীত্ব আর মাতৃত্ব একই কথা, আমাদের দেশের এই সনাতন ধারণা। ইউরোপের অন্য কথা। বিলাতী Blue-stocking থেকে আরম্ভ করে' Golf, Cricket, Football, Tennis, Racing Championshipএ যে মা সকল প্রতিযোগিতা কচ্চেন তাঁদের আর ঠিক মা বলা চলে না। সিগারেট মুখে দিয়ে বা বাঁধা হুঁকা হাতে করে' বসলে (পরমহংসদেব যাই বলুন) মা না বলে' বাবা বলাই ঠিক মনে হয় না কি?

সুধু ফুট্‌বল, ক্রিকেট ইত্যাদিতেই যে মাতৃত্ব অর্থাৎ স্ত্রীত্ব ক্ষুণ্ণ হ'য়ে যাচ্চে তা নয়; অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনায় মাতৃহৃদয় শুষ্ক হ'য়ে গিয়ে, সন্তান-ধারণ-ক্ষমতা লোপ পেয়ে, গৃহস্থালী পরিচালনোপযোগী বৃত্তি সকল শুকিয়ে গিয়ে, ইউরোপে একটা তৃতীয় Sex সৃজন হচ্চে।

কমলাকান্তের বঁধু মিল্‌ল না বটে, আমার হৃদয় শুষ্ক বটে, কিন্তু আমার কথার কোন মূল্য নাই মনে করো' না। আমি বেশ দেখ্‌ছি, যে নারীর মাতৃত্বের বিকাশ না হ'লে বা তা'র অবকাশ না পেলেই, সে পুরুষের কেটে এসে জুড়ে বস্‌তে চায়,—Suffragette হয়, Politician হয়, সমাজ-সংস্কারক হয়, ঘর ও বাহিরের মধ্যে যে প্রাচীর, তা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য হাতিয়ার সংগ্রহ করতে থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে তা'র বক্ষে শিশু মা বলে' তা'র মাতৃত্বকে জাগিয়ে তোলে, তখন তা'র পুরুষত্বের দাবী (যাকে সে মনুষ্যত্বের দাবী বলে' মনে করে) কোথায় ভেসে যায়। লণ্ডনের পথে পথে যখন Suffragetteরা হৈ হৈ করে' অতি অশোভনভাবে তাদের মানুষত্বের দাবী ঘোষণা করে' গগন ফাটাচ্ছিল, আমি বলেছিলাম—হে ইংরাজ, মা সকলকে ঘরবাসী কর, স্বামীর সোহাগ আর সন্তানের মুখচুম্বনের ব্যবস্থা করে' দাও, মা সকলের মাতৃত্বের অমিয় উৎস খুলে দাও, মা সকল আপনার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, পথ দেখিয়ে দাও। কিন্তু ইংরাজ সমাজ সে দিকে গেল না; তার উপর লোক-বিধ্বংসী সমরবহ্নি তাদের যৌন-সংহতি লেহন করে' নিয়ে গেল; সে ব্যবস্থা আরও সুদূরপরাহত হ'য়ে গেল। তাই আজ নারীর নারীত্বের নামে পুরুষের স্বাধিকার মধ্যে হানা পড়ে গেছে। তা'র ঢেউ এখানেও এসে পৌঁছেচে।

আমি দেখেছি বিলাতে যেমন স্বামী মিলে না বলে' স্ত্রীগণ পুংধর্ম্মী হ'য়ে উঠে; আমাদের দেশে স্বামী মিললেও যেখানে স্বামী-সুখ মিল্‌ল না, বা সন্তানের কাকলিতে গৃহদ্বার মুখরিত হ'য়ে উঠল না,

প্রায় সেইখানেই মনটা হঠাৎ বহির্মুখ হ'য়ে উঠে, হাল ফ্যাসানমত কথায় দেশসেবা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদির দিকে মনটা ছুটে বেরিয়ে পড়ে। প্রসন্নর একটি বিড়াল আছে, সে কখন কখন আমার দুধে ভাগ বসায়, সেটাকে প্রসন্ন বড় ভালবাসে ; প্রসন্নর সে মার্জ্জারপ্রীতি, আমি বুঝতে পারি, তা'র বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয়ের সন্তানপ্রীতিরই রূপান্তর আর কিছু নয়। অনেক স্ত্রীসুলভ বাতিক (Hobby) তাঁদের হৃদয়ের কোন-না-কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত শূন্য কন্দর পূর্ণ করার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

রমণীর এই মাতৃত্ব অর্থাৎ স্ত্রীত্ব বজায় রাখবার জন্য, সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুশাস্ত্রকার কন্যামাত্রেরই বিবাহ অর্থাৎ স্বামিসম্পর্কের ব্যবস্থা করেছিলেন। Courtship বা flirtationএর অনিশ্চিৎ জুয়াখেলার উপর যৌন-সম্মিলনের ইমারৎ তোলবার ব্যবস্থা করেন নি। ইউরোপীয় কুমারীগণ অনেক সময় সেই flirtation অর্থাৎ বন্ধু সম্মিলন বা বঁধু সম্মিলনের 'বিষম ঘুরণ পাকে' হাবুডুবু খেয়ে হাঁপিয়ে উঠে, মাতৃত্বে তথা মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে, বিদ্রোহী হ'য়ে উঠচেন।

আমি তাই বলচি—মা সকল, মা হও। কাউন্সিল বল, কোর্ট বল, সভা বল, সমিতি বল, বক্তৃতা বল, বৈচিত্র্য হিসাবে খুব অভিনব হ'লেও, ও-সব পন্থা, মা হওয়ার আগে নয়। "বাবা মেয়ের" দল পুষ্টি করে' সংসারের সর্ব্বনাশ ক'রো না, দেশের সর্ব্বনাশ ক'রো না। আমি বলে' রাখলুম—পুরুষ পুরুষ, স্ত্রী স্ত্রী, the twain shall never meet.

৯

পাগলের সভা

নসীরাম বাবুর একটা অভ্যাস ছিল—তিনি প্রতি রবিবারে তাঁর সদর বাড়ীর উঠানে ভিক্ষার চালের ধামা নিয়ে বস্‌তেন, আর ভিখারীদের নিজে হাতে মুষ্টিভিক্ষা দিতেন। কেহ কেহ বলিত তাঁর এটা একটা বাই; কেহ বা বলিত বাই নয়, চাল; কেহ বলিত অন্যদিন দানের পুণ্যটা চাকরবাকরেই নেয়, কর্ত্তা সপ্তাহের একদিন নিজেই সে পুণ্য অর্জ্জন করেন। নসীরাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করেচি, তিনি আমাকে বলেচেন—সপ্তাহে একদিন গ্রামের গরীব-দুঃখীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, মন্দ কি? তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ত আর হয় না। তা'দের সুখদুঃখের সংবাদ নিলে মনটা থাকে ভাল, অযথা গরম হ'য়ে উপর দিকেও যায় না, আর ম্রিয়মাণ হ'য়ে নিচের দিকেও নেমে পড়ে না; মন্দ কি?

নসীরাম বাবুর এই সাপ্তাহিক মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে কত জনের কত মত; তাঁকে বায়ুগ্রস্ত পর্য্যন্ত বলতেও লোকের বাধে নি। নসীরাম বাবুকে কেউ কখনও জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নি; আপনার মনে এক একটা অনুমান খাড়া করে' নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন পাগলামির বিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞা

দেওয়া যায় না, যেহেতু সহজ মানুষের বিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। পাগল আর সহজের মধ্যে ব্যবধান, কৈশোর আর যৌবনের মধ্যে ব্যবধানের মত—সূক্ষ্ম ও অপরিজ্ঞেয়; কখন্ কৈশোর গিয়ে যৌবন এলো যেমন ধরা যায় না, সহজ মানুষ কখন্ পাগল হ'ল, ঠিক সে সন্ধিক্ষণ অন্তর্যামী ভিন্ন কেহ বুঝতে বা জানতে পারে না। কে পাগল আর কে সহজ তা'ও ঠিক ধরা কঠিন। যুক্তি, ন্যায় বা তর্ক শাস্ত্রের আইন, চোখ চেয়ে অমান্য করলে যদি মানুষকে পাগল বল্‌তে হয়, তা হ'লে নসীরাম বাবুর কার্য্যের সকল সমালোচকই পাগল; যেহেতু তাঁরা সকলেই, কার্য্যমাত্রের কারণানুসন্ধানরূপ মনুষ্য হৃদয়ের প্রবলতম স্পৃহার বশবর্ত্তী হ'য়ে, ন্যায়ের মাথায় পদাঘাত করে', এক একটা মনগড়া অনুমান খাড়া করে' নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন; সে অনুমানের পশ্চাতে না ছিল যুক্তি, না ছিল প্রমাণ। পাগলামী জিনিষটাই এত জটিল বা স্থিতিস্থাপক যে কাহাকেও পাগল বা সহজ বল্লে, সর্পে রজ্জুভ্রম হ'ল কি না বলা কঠিন।

নসীরাম বাবুর রবিবারের অতিথিদের মধ্যে কতকগুলি, যা'কে লোকে সচরাচর পাগল বলে, সেই পাগল ছিল; কেহ কেহ আমাকেও সে দলভুক্ত করত। তথাকথিত সহজ ভিখারী বা ভিখারিণীগণ চলে' গেলে নসীরাম বাবু তবে পাগলগুলিকে ভিক্ষা দিতেন, এবং তাদের নিয়ে একটু রঙ্গরস করতেন; ভিক্ষার শেষে নসীরাম বাবুর উঠানে একটি পাগলের সভা বসত বল্লে ভুল হয় না। সে সভার সভাপতি স্বয়ং নসীরাম বাবু, আমি দর্শক বা reporter মাত্র। আমি এক রবিবারের সভার proceedings report করছি।

নসীরাম বাবু। কি হে মাখন, কেমন আছ?

মাখন অন্যমনস্ক ভাবে একটু হাসিল মাত্র। মাখন কোমরে কাপড় না পরে' গলায় কাপড় পরে; সে বলে কোমরে কাপড় জড়ালে অনেকখানি কাপড় বাজে নষ্ট হয়; গলায় কাপড় পরলে, অল্প লম্বা কাপড়েই চলে,—মিছে বাজে খরচ কেন?

নসীরাম বাবু। মাখন, সে দিন বাজারে মেছুনী মাগী তোমার গায়ে জল দিয়েছিল কেন হে?

মাখন। আজ্ঞে, মেছুনী বেটী বলে আমি উলঙ্গ, আমার কোমরে কাপড় নেই বলে'। আমি বল্লাম বেটি কোমরে কাপড় নেই ত কি হয়েছে, আমার দেহটা ত ঢাকা আছে? বেটি তবুও বলে,—পাগলা, তোর গায়ে কাপড় থাকলে কি হয়, তুইও কাপড়ের ভিতর নেংটা। আমি বল্লাম—বেটি, তোর কোমরে কাপড় থাকলে কি হয়, তুইও কাপড়ের ভিতর নেংটা! বেটি আমার গায়ে আঁস জল দিলে—বেটি পাগলী!

রতনা পাগলা ততক্ষণ একটুকরা ইট্ নিয়ে নসীরাম বাবুর সানবাঁধান উঠানের খানিকটা লিখে লিখে ভরিয়ে দিয়েছে।

নসীবাবু। রতন, কি লিখছ?

রতন। আজ্ঞে বেটা জমীদার জমীদারই আছে; রামা কেওরার উপর কি অত্যাচারটা করেচে বলুন দেখি! বেটাকে হাজতের হুকুম দিলুম, আর ৩০৪ ধারা মতে তা'র উপর মামলা চালিয়ে দিলুম।

নসীবাবু। গ্রামের জমীদার হাজার হ'ক, তা'র অত করে'

নিগ্রহ করলে—ভাল করলে কি ?

রতন। ভালমন্দ কিছু নেই ; তা বলে' আপনি যেন তা'র হ'য়ে সাক্ষী দেবেন না ; বিপদে পড়বেন বলে' দিচ্চি।

নসীবাবু। আরে তা কি আমি করি ! তুমি যখন দাঁড়িয়েছ তখন কি আর জমীদার বাবুর রক্ষা আছে ? তা বাবু তোমার টাকা-গুলোর কি ব্যবস্থা করলে ?

রতন। তা'রও পয়ার করেচি ; সিভিল জেল ঠেলে দিচ্চি।

নসীবাবু। কতদিক করবে ? ফাঁসীও দেবে, জেলও দেবে ?

রতন। যেটা লাগে।

নসীবাবু। মাথাটা আজ একটু বেশী গোলমাল দেখছি না রতন ?

রতন। মাথাটা আমার ঠিকই আছে, জানেন। আমি পাগল যা মনে আসে তাই বলি, আর আপনি যাকে যা মনে আসে তা বলেন না—এই মাত্র প্রভেদ। মনে মনে সবাই পাগল, রতনা কিছু ফাঁস।

শেষের কথাগুলো আবৃত্তি করতে করতে রতনমণি চট্টোপাধ্যায় আপনার গোঁ ভরে' উঠে চলে' গেল, তা'কে ফেরান গেল না।

গোপাল দে ছিল স্কুলমাষ্টার। ক্লাসে Goldsmithএর Village Preacher পড়াতে পড়াতে তা'র মাথা গোলমাল হ'য়ে যায়।

Those who came to scoff remained to pray এই ছত্রটা গুরুগম্ভীর ওজনে পাঠ করে' গোপাল একদিন ছেলেগুলোকে

জিজ্ঞাসা করলে—'বাহাদুরী কার?' ছেলেরা হাঁ করে' রইল। গোপাল বার বার উক্ত পদটী আপন মনে পাঠ করলে, যত পড়ে তত গরম হ'য়ে উঠে। শেষে আপন মনে বলে' উঠল—মূর্খ কবি! কেন remained to pray?—আরে বেটা, সে কি তোর পাদ্রীর বাহাদুরী না those who came to scoff তা'দের বাহাদুরী? তা'দের ভিতর যে ছাইচাপা আগুন ছিল, তোমার পাদ্রীর বক্তৃতার ফুৎকারে সেই ছাইগুলো মাত্র উড়ে গেল—আর প্রচ্ছন্ন অগ্নির রক্তবিভা প্রকটিত হ'য়ে পড়ল; পাদ্রীর ফুঁ আর তাদের আগুন। আগুন যদি না থাকত বা আগুন যদি নিবে গিয়ে থাকত, তুমি বেটা পাদ্রী ফুঁ পেড়ে পেড়ে চক্ষু রক্তবর্ণ করলেও আগুন জ্বলত না। ছাতারের বাসায় কোকিলের ডিম্, সে ডিমের ভিতর কোকিলের কুহুতান সুষুপ্ত থাকে—ছাতারে তা দিয়ে ফোটায় বলে' কি বাহাদুরী তা'র? ক্ষুদ্র বীজের ভেতর শেফালির সৌরভ নিদ্রিত, উড়ে বেটা গাছের গোড়ায় জল দেয় বলে' কি সৌরভের স্রষ্টা সে? জগাই মাধাই যদি খাঁটি সোনা না হ'য়ে প্রকৃতই খাঁটি লোহা হ'ত, তাদের লৌহ-হৃদয়কে গিল্টি করা চলত, সোনা করা সম্ভব হ'ত না। রত্নাকরের মুখে 'মা নিষাদ—' ইত্যাদি শ্লোক বহির্গত হ'ত না, "মরা মরা" মন্ত্র আওড়ান সত্ত্বেও, যদি বাল্মিকীর করুণা-বিগলিত-হৃদয় রত্নাকরের বুকে প্রচ্ছন্ন না থাকত; রামায়ণের মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত রত্নাকরের খুনে হৃদয়ের অন্তরতম স্তরে, অন্তঃশীলা ফল্গুর মত, গুমরিয়া গুমরিয়া ঝঙ্কৃত হ'তই হ'ত। নাবস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ—nothing comes out of nothing.—ছেলেরা বেগতিক দেখে হেড্মাষ্টারকে খবর

দিলে। হেডমাষ্টার গোপালকে ছুটি দিয়ে বাড়ী যেতে বল্লেন। গোপালের সেই ছুটীতেই ছুটি। সে অবধি "বাহাদুরী কার?" গোপালকে এই প্রশ্ন করলে গোপাল বলত—"তাই ত, কার বাহাদুরী? কে জানে কার? যার তারই হবে।"—ইত্যাকার অসংলগ্ন প্রশ্ন করতে করতে আপনার অন্তরের মধ্যে ডুবে তলিয়ে যেত।

নসীবাবু বল্লেন—'গোপাল, বাহাদুরী কা'র বুঝতে পেরেছ?'

গোপাল নিরুত্তর থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে; তা'র মুখে একটা নিদারুণ বিহ্বলতার ভঙ্গী ফুটে উঠল। তা'কে আর কোন প্রশ্ন করা চলল না।

নসীবাবু। মধু, আজ গঙ্গাস্নানে যাবে না?

মধুসূদন দাস, জাতিতে মুচি. বললে—"বাবু, আমাকে রাগাবেন না"; সে কিন্তু তা'র আগেই রাগে গর গর করতে সুরু করেচে।

নসীবাবু। চট কেন, মধুসূদন? এত লোক গঙ্গাস্নান করে, পতিতপাবনী গঙ্গা, গঙ্গায় নাইবে না ত কোথায় নাইবে?

মধু। এজ্ঞে, তা জাননা? বাবু, ছাস্তর জাননা? শোন, হ্রদে নাইবে, নদে নাইবে, পকুরে নাইবে, ডোবায় নাইবে, পাতকোয় নাইবে, দামোদরে নাইবে, রূপনারাণে নাইবে,—গঙ্গায় নাইবে না, ছরস্বতীতে নাইবে না, পদ্মায় নাইবে না,—মেয়ে মানুষকে মাথায় করবে? ছ্যাঃ—

নসীবাবু। মধু, গঙ্গা যে মহাদেবের জটায় ছিলেন তা জান ত? মহাদেব কেমন করে' মাথায় কল্লেন?

মধু। পিরীতে, পিরীতে—

মাখন মধুসূদনের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল; মধুর কথা শেষ হ'লে "পাগল রে" বলে' হেসে উঠল।

আমি কিন্তু এই ব্যক্তি চতুষ্টয়ের মানসিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে পাগল ও সহজের সীমানির্দ্দেশ করতে পারলুম না। লোকে এই লোকগুলোকে কেন পাগল বলে, আর তাঁরা নিজেই বা কিসে সহজ, তা'র বিচার আমি করতে অক্ষম। প্রচলিত চিন্তাস্রোতের যারা উজানে যায় তারাই পাগল, আর সেই স্রোতে গা ভাসান দিয়ে যারা আরামে ভেসে চলে তারাই সহজ, একথা কেহ স্বীকার করবে না। গড্ডলিকাবৃত্তি পরিত্যাগ করে' নূতন পথ আবিষ্কার করতে গেলে বা নূতন চিন্তার ধারা বহাতে গেলে, কখন্ মৌলিকতা ছাড়িয়ে পাগলামি এসে পড়ে, তা'ও আমি ঠিক বলতে পারলুম না। তবে আমি এই বুঝলুম যে হঠাৎ লোককে খ্যাপা বলা চলে না।

অবশেষে, যাঁরা নারীর মঙ্গল করবার জন্য, এবং সেই সঙ্গে পুরুষজাতির তথা মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যস্ত, তাঁদের এই মধু পাগলার কথাগুলি তলাইয়া বুঝিতে অনুরোধ করি। রমণীমাত্রেই দেবী বলিয়া তাঁহাদিগকে মাথায় করিবার প্রয়োজন নাই, তাহাতে প্রত্যবায়ই আছে। রমণীমাত্রেই যদি প্রচ্ছন্না দেবী হন, ত পুরুষ মাত্রেই প্রচ্ছন্ন দেবতা। বলা বাহুল্য, দুইটার একটাও সত্য নহে। তাই রমণীকেও বলি, আর পুরুষকেও বলি, মাথায় কাহাকেও বসাইও না; তবে "পিরীতে" যে খেলা খেলিতেই হইবে, তা'র চারা নাই।

১০

খোদার উপর খোদকারী

কেউ বলতে পার, আমি কমলাকান্ত বলে' আফিম খাই, না আফিম খাই বলে' আমি কমলাকান্ত? প্রসন্ন দুধে জল দেয় বলে' সে প্রসন্ন, না প্রসন্ন বলে' দুধে জল দেয়? কেউ বলতে পার না তা আমি জানি, যেহেতু সৃষ্টিকর্ত্তার কারখানার ভিতরকার খপর কা'রও জানা নেই। কিন্তু তবু তোমরা খোদার উপর খোদকারী করতে ত ছাড়বে না—তোমরা নাক সিঁটকে বলবে—কমলাকান্ত লোকটা এদিকে বেশ বটে, তবে মানুষটা কিছু নয়, যেহেতু সে আফিমখোর। কিন্তু এটা ভেবে দেখনা কেন যে, আফিম খায় না এমন কমলাকান্ত হ'তে পারত কিনা, দুধে জল দেয় না এমন প্রসন্ন হ'তে পারত কিনা? খোদা স্বয়ং এ দুই বস্তুকে এক করেচে,—যথা কমলাকান্ত ও অহিফেন, তখন ওদুটা পদার্থের একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে বলেই ত। আর ঐ "খোর" বলে' যে গাল দাও, সেটা বাড়ার ভাগ; যেহেতু কমলাকান্ত ভাত খায়, তা'র বেলা ত কথার সামঞ্জস্য রেখে তা'কে "ভাতখোর" বল না। বলবে "কলৌ অন্নগতাঃ প্রাণাঃ", ওটা মনুষ্যসুলভ লক্ষণ, অতএব দোষ কিসের? কিন্তু জানবে

কমলাকান্তও অহিফেন-গত-প্রাণ, সেটাও তা'র লক্ষণ, অতএব তা'কে আর আফিংখোর বলিও না।

যদি বল, কেন, খোদা ইচ্ছাময়, তিনি কি মৌতাতী নয় এমন কমলাকান্ত, বা দুধে জল দেয় না এমন প্রসন্ন, ইচ্ছা করলে সৃজন করতে পারতেন না? নিশ্চয়ই পার্ত্তেন না তাই করেন নি; তা'হলে ত তিনি আরও কত অঘটন সংঘটন করতে পারতেন,—মেয়েমানুষের হিংসা করে না এমন মেয়েমানুষ সৃজন করতে পারতেন; বিষহীন গোখুরা সৃজন করতে পারতেন, শষ্পাহারী সিংহ, মাংসাশী ঘোটক সৃজন করতে পারতেন; অমর মানুষ সৃজন করতে পারতেন; সাদা কাফ্রী ও কাল সাহেব এ সবই পারতেন! পারতেন অথচ করেন নি, একথা আমি মানি না; করেন নি পারেন নি বলে', কারণ তাঁরও কাজের একটা বাঁধন আছে; তিনি খোদা বলে' ত নবাব সিরাজুদ্দৌলা নন।

থিয়েটারের অভিনেত্রীবর্গকে শ্রেণীবিশেষ থেকে আমদানী করা হয় বলে', এক শ্রেণীর ছুঁচিবাইগ্রস্ত লোক আছেন, তাঁরা থিয়েটার দেখতে যান না। ছুঁচিবাইয়ের পশ্চাতে কি আছে আবিষ্কার করবার দরকার নেই; কিন্তু তাঁরা যে চোরের উপর রাগ করে' ভুঁয়ে ভাত খান, তা'তে চোরের বড় বয়েই গেল। তাঁরা একবার ভেবে দেখেন না, সমস্ত জীবনটা যাদের সুধু অভিনয় করেই কাটে, তা'রা অভিনেত্রী হ'বে না ত হ'বে কে? মল্ল কেন মল্ল হবে, উকীল কেন উকীল হবে, তাঁরা একথা কেন বলেন না বুঝতে পারি না। কেউ কি দেখাতে পারেন, কোন দেশে, কখনও যুধিষ্ঠির আর সাবিত্রীকে

নিয়ে অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন করে' নাট্যকলার পরিণতি হ'য়েছে ? তা' হ'তে পারে না, আর হ'তে পারে না বলেই, হয় নি। Sarah Bernhardt—যাকে Divine Sarah বলে, বা Ellen Terry, বা সুকুমারী দত্তকে যদি সাবিত্রী হ'তে হ'ত, তা হ'লে আর অভিনেত্রী হওয়া হ'ত না—হয় সাবিত্রী নয় অভিনেত্রী—দুইই এক সঙ্গে, হ'তে পারে না, হয় নি, হবে না। অভিনেতা সম্বন্ধেও সেই কথা। তবে যদি কেউ বলেন—তবে চুলোয় যাক অভিনয়! যায় যাক! কিন্তু সাবিত্রীকে অভিনেত্রী করলেও তাই হ'বে, অভিনয় চুলোয় যাবে। থিয়েটারকে ঠাকুর ঘরের আইন দিয়ে বাঁধলে চলবে না। কারও কারও ধারণা থাকতে পারে যে, বিলেতে এমনটা হয় না; তাঁরা ভুলে যান যে, "বিলেত দেশটাও মাটির, সেটা সোনার রূপোর নয়"। সেখানে Stage একটা profession বটে এবং honorable profession ও বটে; কিন্তু honorable কেন? নাট্যশালাটা কলাভবন বলে', ঠাকুর ঘর বলে' নয়; নট ও নটীরা যথাক্রমে যুধিষ্ঠির ও সাবিত্রী বলে' নয়। সেখানে গীর্জ্জার আইন Stageএ চালাবার ধৃষ্টতা কেউ রাখে না। সে দেশে নটীরা stage থেকে বাজারে আসে, এখানে বাজার থেকে stageএ যায়, আগু আর পিছু, এইমাত্র প্রভেদ। ফলে দাঁড়িয়েছে যে সে দেশের নাট্যকলা স্ফূর্ত্ত হ'য়ে সুন্দর হয়েচে, আর আমাদের দেশে যে ভ্যাংচান সেই ভ্যাংচানই র'য়ে গেছে।

আমি একবার মস্তবড় জায়গায়, মস্তবড় শোক সভায়, উপস্থিত ছিলাম; মস্তবড় এক মহারাজা সে সভার সভাপতি; মস্তবড় পণ্ডিত, মস্তবড় ধর্ম্মাধিকরণের ধর্ম্মাধিকার বক্তা। যে পুরুষসিংহের মৃত্যুতে

এই শোক সভার অধিবেশন হয়েছিল, তাঁকে ত আমরা "তিরস্কার পুরস্কার, কলঙ্ক কণ্ঠের হার" পরিয়ে ভবনদী পার করে' দিয়েছিলুম। সেইখানেই যবনিকা পতন হ'য়ে, সব শেষ হ'য়ে গেলে আমার কিছু বলবার থাক্‌ত না; কিন্তু শোক করতে গিয়ে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র সঙ্গে সঙ্গে, খোদার উপর খোদকারী করতে দেখে, আমার পিত্ত পর্য্যন্ত দগ্ধ হ'য়ে গেল। বক্তার পর বক্তা উঠে বলতে লাগলেন—নাটককারের নাটকগুলি চমৎকার, বঙ্গসাহিত্যের রত্নভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম রত্ন স্বরূপ; তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যও অদ্ভুত—কিন্তু, নাটক ছেড়ে নাটককারের কথা ভাবলে, হৃদয়ে অনুশোচনা আসে, দুঃখ হয়;—নাট্যকার হিসাবে এতবড় হ'লেও মানুষটা এত হীন মনে হ'লে লজ্জা হয়।

আরে আমার লজ্জাবতী লতা! প্রভুদের এই sanctimonious scruples, এই ছুঁচিবাই দেখে, আমি হাড়ে হাড়ে জ্বলছিলুম—কেন আমি বক্তৃতা করিতে শিখি নাই, তা হ'লে বাক্যের বন্যায় এই খড়কুটা আবর্জ্জনাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কালাপানিতে পৌঁছে দিতুম; অথবা যদি বাহুতে বল থাক্‌ত, ত টাউনহলের থামগুলোকে আলিঙ্গনে চূর্ণ করে', Samsonএর মত নিজেও চাপা পড়ে মরতুম—এ অমানুষগুলোকেও চাপা দিয়ে মারতুম। তা হ'ল না; যেহেতু আমি সুধুই কমলাকান্ত মাত্র। নিন্দাস্তুতির অতীত হ'লেও, মুক্ত আত্মার তর্পণের জন্য একটা কথাও বলতে পারলুম না বলে' আমার চোখে জল এল।

কিন্তু এত বড় সভায় কি একটা মানুষ নেই—সবাই কি

নিরিমিষ্যি আতপ তণ্ডুল ও অপক্ক কদলী ভোজীর দল—এমন কেউ নেই যে বলে—হে পণ্ডিতম্মন্যগণ, এ অবিভাজ্য বিভাগ কি হিসাবে কর? এ যে অদ্বৈত, লেখার অন্তরালে লেখক, সৃষ্টির অন্তরালে স্রষ্টা, প্রকৃতির অন্তরালে পুরুষ! একটা দূর করে' দিলে কি আর-একটা টিকে? রাখ তোমার ছুঁচিবাই, তোমার শবব্যবচ্ছেদ। এমন সময় এক দিব্যজ্যোতি যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান হ'য়ে, সেই বিশাল কক্ষতল কম্পিত করে' গর্জ্জে উঠল,—গিরিশ বাবুকে ভগবান একটা অখণ্ড মানুষ করে' পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর দেহ মন নিয়ে তিনি একটা গোটা মানুষ; কোন্ অধিকারে আপনারা সেই গোটা মানুষটাকে খণ্ড খণ্ড করে', তার হাতটা ন'ব, পাটা ন'ব না, মাথাটা ন'ব, ধড়টা ন'ব না, এই ব্যবস্থা করচেন? নিতে হয় সমস্তটা নিন, তাঁর নাটক নিন, মদের বোতলও নিন—আর সাহস থাকে ত সমগ্র মানুষটাকে পরিত্যাগ করুন—তাঁর নাটকগুলোকে বগলদাবায় করে' মানুষটাকে স্বারস্বত কুঞ্জ থেকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বহিস্কৃত করে' দেবার আপনাদের অধিকার নেই, সাধ্য নেই।' আমি বল্লাম—বহুত আচ্ছা, জীতা রও।

যিনি যুগের মানুষ, যুগাবতার, তিনি গিরীশ বাবুর 'চৈতন্য লীলা' নাটকের অভিনয় দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন; সংজ্ঞা হ'লে নাটক-কারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। গিরিশ বাবু তখন জগাইএর ভূমিকা গ্রহণ করে' জীবন্ত জগাইরূপে গ্রীনরুমে অধিষ্ঠান কচ্চেন। যুগাবতার সেইখানেই গিয়ে উপস্থিত; একদিকে মাতাল গিরিশ, আর-একদিকে সত্বগুণের আধার পরমহংস দেব;

তিনি সমগ্র মানুষটাকে দেখে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন ; মদের গন্ধে ভিরমি যান নি।

আমি তাই বলি, দু'শ' মানুষ খুন কর, আর রামায়ণের বিগলিত করুণার প্রস্রবণ বহিয়ে দাও ; দু'শ বোতল মদ খাও, আর বিল্বমঙ্গল, চৈতন্যলীলা, প্রফুল্ল, সিরাজদ্দৌলা লেখ ; দু'শ রজকিনী রামীর প্রেমে মজে' মজগুল হ'য়ে পদাবলীর লহরী ছড়িয়ে দাও, আমি তোমায় মাথায় করে' নাচব। "কে কাকে মারে, তিনিই মেরে রেখেছেন" বলে' খুনকে খুন নয় প্রমাণ কর্ত্তে চেষ্টা করব না ; মদকে "কারণ" বলে' মনকে আঁখি ঠারব না, আর রজকিনী রামীকে শ্রীরাধিক প্রতিপন্ন না করে' তা'কে রামী ধোপানিই বলব, এবং তা'র সম্পর্ককে দেহের সম্পর্কই বলব। আধ্যাত্মিক, অহেতুকী, আত্মিক ইত্যাদির কুজ্ঝটিকা সৃজন করে' বুজরুকি করব না। কিন্তু খবরদার ! প্রথমটা করেই শেষ করে' দ্বিতীয়টা পাওনা রেখে দিও না, রাসলীলা করে' শেষে গোবর্দ্ধন ধারণের বেলায় পেছিও না ; লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করব !

১১

আবিষ্কার না বহিষ্কার

কত হাজার বছরের কথা—মাটির ভিতর এক রাজার কবর, কবরের ভিতর মণিমাণিক্য খচিত এক স্ফটিকের পেটারি, ত'র ভিতর রাজার নশ্বর দেহ—কত স্নেহের, কত ভক্তির, কত সোহাগের সৌরভে ভরপুর। এক দিন পেটের দায়ে মাটি কাটচে এক চাষা, কোদালের কোণ ঠং করে' লাগল সেই কবরের গায়; চাষা খুঁড়ে চলল, ভাবলে এইবার যক্ষের ধন বুঝি মিলল; খুঁড়ে বা'র করলে সেই স্ফটিকের পেটারি, খুলে ফেলল তা'র ডালা—কি অপূর্ব্ব সৌরভ, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সে সহস্র বৎসরের ঘুমন্ত রাজার, কি অপূর্ব্ব জ্যোতি সে মণিমাণিক্যের—কিন্তু দেখতে দেখ্‌তে সে সৌরভ উপে গেল, রাজার ঘুমন্ত মূর্ত্তি উপে গেল, মণিমাণিক্য ধূলায় পরিণত হল; স্পর্শ করবার আগেই, আলো লেগে, বাতাস লেগে, চাষার লুব্ধদৃষ্টি লেগে যেন সব গলে' গেল, বাতাসে মিশিয়ে গেল। চাষা যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখলে মাত্র!

পেটের দায়ে না হ'ক—আর পেটের দায়ে নয়ই বা কেন? একটু ঘুরিয়ে দেখলে, পেটের দায়েই—পুরাতন কবর খুঁড়ে পুরারত্ন বা'র করবার বড় ধুম পড়ে' গেছে। টাটকা কবর খুঁড়ে মড়া বা'র

করে' যারা উদরস্থ করে, তাদের বলে ghoul. Ghoul এক রকমের প্রেতযোনি, আধা মানুষ আধা ভূত। পুরাতন কবর যারা খোঁড়ে তাদের বলে পুরাতত্ত্ববিৎ—আমি বলি পুরা-ghoul. সত্যিকারের ghoulগুলো মড়া খুঁড়ে বা'র করে' খায়, পুরা-ghoulগুলো মড়া বেচে, তা'র অস্থি বেচে, তা'র ছাই বেচে টাকা রোজকার করে, আর সেই টাকার বিনিময়ে রুটি ও পনির কিনে খায়, এই তফাৎ। আর রাজার কবরটা—কত স্নেহে স্নিগ্ধ, কত ভক্তিতে সুরভিত, কত মহিমায় মহিমান্বিত—রাজার কবরটা উপে যায়; উপে যায় বই আর কি বলব? সাত সমুদ্র তের নদী পার, কোথায় পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের গুদামে খণ্ড খণ্ড, শত খণ্ড হ'য়ে শত গুদামে গস্ত হয়। সে থাকাকে যদি থাকা বল ত' নিমতলার ঘাটের খেয়া পার হ'লেও, তুমিও থাক আমিও থাকি, সকলেই থাকি। পাঁচ ভূতের সঙ্গে মিশিয়ে থাকি ত?—কিন্তু সে কি তোমার থাকা না আমার থাকা? সে ভূতের থাকা, বলতে পার বটে। তেমনি সে পুরাতাত্ত্বিক গুদামে চারিয়ে পড়ে' থাকাকে যদি রাজার থাকা বল, আমার আপত্তি নেই।

এই পুরা-ghoulদের উৎপাৎ হয়েছে সব চেয়ে বেশী দুটা দেশে—মিশরে আর ভারতবর্ষে। দুটাই পরাধীন দেশ, সুতরাং ভূতের উৎপাৎ ত হবারই কথা। কিন্তু সেটা যে ভূতের উৎপাত আমি কমলাকান্ত ত বললে কেউ শুনবে না—বলবে গবেষণা, পুরাবস্তু-আবিষ্কার, লুপ্ত-রত্নোদ্ধার ইত্যাদি। কিন্তু আবিষ্কার মানে ত আমি এতাবৎ ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। শুনেছি সার

উইলিয়ম জোন্স্ কারও কারও মতে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আবিষ্কার করেছিলেন। সে আবিষ্কারের মানে ঠিক পাতাল খুঁড়ে বা'র করা নয়; তা'র মানে হচ্চে এই যে, তাঁর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে তথা ইউরোপে কারও জানা ছিল না, যে সংস্কৃত বলে' একটা ভাষা ও সাহিত্য আছে; তিনি জানলেন এবং তাঁর দেশের লোককে জানালেন। কিন্তু জানলেন ও জানালেন বলে' কি, যত পুঁথি আর পুস্তক জাহাজ বোঝাই করে' এদেশ থেকে নিউইয়র্ক, আর লণ্ডন, আর পারিস্, আর বার্লিনে নিয়ে গিয়ে গস্ত করতে হবে? আবিষ্কার মাত্রই বহিষ্কার বা সমুদ্র পারে চালান করে' দিতে হবে? যদি বল কেউ কি জোর করে' নিয়ে গেছে? কতক জোর করেই নিয়ে গেছে, কতক চোখে ধুলো দিয়ে নিয়ে গেছে, কতক পয়সা দিয়েও নিয়ে গেছে। আমি সবই জোর করে' নিয়ে যাওয়ার সামিল মনে করি। বুভুক্ষিতকে উদরের জ্বালা নিবৃত্তির জন্য, দু' পয়সার ছাতু কিনে দিয়ে, তা'র কুঁড়ে ঘরে সযত্ন রক্ষিত অমূল্য পুঁথিখানা দেশের কুল রাজ্যের কূলে পাচার করে' দেওয়াকে আমি জোর করে' নিয়ে যাওয়াই বলব। জোরটা সরাসরি পুঁথিখানার উপর না পড়ে' তা'র উদরের উপর অর্থাৎ তা'র প্রাণের উপর পড়ল, এইমাত্র প্রভেদ। আর ক্ষিদে বহু রকমের হ'তে পারে—পেটের ক্ষিদে, যশের ক্ষিদে, খেতাবের ক্ষিদে ইত্যাদি।

মাটির ভিতর থেকে বা মাটির উপর থেকে পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করায় আবিষ্কারকের কোন স্বত্ব জন্মায় তা আমি মানি না। লড়ায়ে হারলে বিজিতের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে বিজেতার স্বত্ব আমি মানি।

মিসরবাসী তেল-এল-কেবিরের যুদ্ধে হেরেচে, বাঙ্গালী পলাসির যুদ্ধে হেরেচে; তা'র জন্য বিজেতার দাবী, পরাজিত মিসরবাসী ও বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী মান্‌তে বাধ্য; কিন্তু সে দাবীর কথা না তুলে' যদি কেহ আবিষ্কারকের দাবীর কথা তুলে, আমি তা'কে প্রতারক বলব। মহমুদ সোমনাথ লুঠ করে' লুণ্ঠনলব্ধ রত্নসম্ভার গজনি চালান করেছিল, আবিষ্কারকের বুজরুকি করেনি। আর লুণ্ঠনকার্য্যটা জয়ের অব্যবহিত পরেই কর, আর র'য়ে-বসে' সুবিধামত করতে থাক, একই কথা। কিন্তু সে কথা স্পষ্ট করে' বল, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করব। আর আবিষ্কার করলে যদি স্বত্বই জন্মায়, আমি বলব আবিষ্কার করা ব্যবসাটা ছাড়! এ তোমার মাটি খুঁড়ে কয়লা আবিষ্কার করা নয়; নিয়ে যাও তুমি কয়লা, নিয়ে যাও তুমি সোনা, আর তাঁবা, আর লোহা, আর টিন— তা'তে ভারতবর্ষ গরীব হবে না; কিন্তু আবিষ্কার আর পুরাতত্ত্বের নামে কবর খুঁড়ে মহাপুরুষের অস্থি—আর মন্দির হ'তে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি,—মন্দিরগাত্র হ'তে অপূর্ব্ব চিত্র আর কারুশিল্পের নিদর্শন জাহাজে বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেও না, তা'তে ভারতবর্ষের যে দীনতা আসবে তা'র সীমা নাই; ঐ অস্থি, ঐ প্রতিমূর্ত্তি, ঐ শিল্প-মহিমা ভারতকে একদিন প্রাচ্যদেশের তীর্থস্থান করেছিল—ভবিষ্যতের সে সম্ভাবনাকে একেবারে অসম্ভব করে' দিও না।

লর্ড কর্জ্জনের আইন পুরাবস্তুকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেচে; পুরাবস্তু অর্থে মাটির উপর বা গুহার মধ্যে যা কিছু দৃশ্যমান; সেগুলিকে নষ্ট করার বা বিকৃত করার প্রতিষেধক কতগুলি আইন-

কানুন হয়েচে। তা'তে কবর খুঁড়ে অস্থি বা ভক্তগণ-স্থাপিত-মূর্ত্তিকে, স্থানচ্যুত করে' গুদামজাত করার কোন প্রত্যবায় হয় নি। ভারুটের বৌদ্ধস্তূপের বিচিত্র শিল্প-সম্পত্তি কলিকাতার যাদুঘরে জমা করা দেখলে, চিৎপুরের ট্রামের ঘর্ঘর, বেচা-কেনার কোলাহল কচকচি, ধূম ও ধুলার অন্ধকারে, খাঁচার ভিতর বন্দী কোকিল বা পাপিয়ার কণ্ঠস্বর মনে পড়ে; মুক্ত বাতাস, মুক্ত আকাশ থেকে বঞ্চিত করে' যে হৃদয়হীন তা'কে চিৎপুরের জাফ্রিঘেরা বারান্দার ভিতর পিঞ্জরবদ্ধ করেচে তা'কে অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করে। আমার মনে হয় বন্দী পাখীগুলোর মত বন্দী পাথরগুলোর প্রাণ আর্ত্তনাদ করচে! তাই আমি বলি যেখানে যা পাও বা আবিষ্কার কর, সেইখানেই যত্ন করে' সংরক্ষণ কর; স্থানচ্যুত করে' সংরক্ষণ, ইতিহাসেরও মাথায় পা দিয়ে ডুবান! খরচে কুলাবে না—পয়সা নেই, সে সব বাজে কথা। যদি সে খরচ না যোগাতে পার, আবার বলি, আবিষ্কার করা ছেড়ে দাও। যেখানকার জিনিষ সেইখানেই থাক, এতদিন ত ছিল. আরও কিছুদিন থাক। ভক্তের আরাধনার বস্তু ভক্ত যেখানে স্থাপন করেছিল—সেই জল স্থল আকাশ নদ নদী বৃক্ষলতা তা'রই মধ্যে থাক; সেখান থেকে তুলে এনে গুদাম ঘরে পুরে রাখলে কি ভক্তের বুকে, আর সেইসঙ্গে ইতিহাসের বুকে ছুরি দেওয়া হয় না? তুমি বলবে ভক্ত কই? সে ঠিক কথা, ভক্ত নেই, ঐতিহাসিক আছে। মুসলমান ভাই সকলের প্রতাপে কোন নিভৃত জঙ্গলের ভিতরকার একটা ক্ষুদ্র দরগার একখানি ইষ্টক সরিয়েছ কি কানপুরী দাওয়াইএর ব্যবস্থা। মুসলমান ভাইগণের

এই জবরদস্তি ভাবকে কেউ কেউ fanaticism বলেন ; কিন্তু এই fanaticism পুরাবস্তু সংরক্ষণ কল্পে লর্ড কার্জ্জনের আইন অপেক্ষা বলবান। কিন্তু আমরা জবরদস্ত নই—আমরা উদার, আমরা মহান, আমরা সনাতন! ইটালি যখন অষ্ট্রীয়ার কুক্ষিগত, গ্রীস যখন বারভূতের সম্পত্তি, তখন ঐ দুই দেশের পুরাবস্তু নিয়ে অনেকেই ছিনিমিনি খেলেছিলেন—যে যা পেয়েচেন লুটে নিয়ে গিয়েছিলেন ; ইটালিকে এখন সে সকল art treasure ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্চে ; ভারতের লুণ্ঠিত রত্নরাজি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কবে হবে ? কে করবে ?

১২

"নিরুপদ্রবী"

অহিফেন প্রসাদাৎ আমি বহুদিন যাবৎ প্রায় সকল বস্তু, ব্যক্তি ও ব্যাপারের সঙ্গে অসহযোগ এবং খুব নিরুপদ্রব অসহযোগ করে' বসে' আছি; কেবল একটি জিনিষের সঙ্গে করি নাই; কেন-না করিতে পারি নাই; সেটি প্রসন্নের মঙ্গলা গাইয়ের দুধ। এবং আমার বিশ্বাস যতক্ষণ দুধে হাত না পড়ে, ততক্ষণ নির্ব্বিবাদে অসহযোগ নীতি খুব নিরুপদ্রব ভাবেই অনুসরণ করা চলে। পেটে খেলে পিটে সয়; কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে সেই প্রাণধারণের উপায়ীভূত দুধ বা ভাত বা দুধ-ভাতের উপর কেহ উপদ্রব আরম্ভ করে' তখন আর উপদ্রুত ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নিরুপদ্রব থাকা চলে না। যদি সে নিদারুণ অবস্থাতেও সে বা তা'রা নিরুপদ্রব থাকে, তবে বুঝতে হ'বে যে সে বা তা'রা সব উপদ্রবের বাহিরে গিয়ে পড়েছে অর্থাৎ গতাসু হয়েছে।

বার্ণহার্ডির War is a biological necessity মন্ত্রের উপাসক জার্ম্মাণ জাতি ফরাসির ঠেলার চোটে মন্ত্রটাকে পাল্‌টে নিয়ে Non-violent non-co-operation is a logical necessity এই নূতন রূপ প্রদান করায় আমার বড় আনন্দ

হয়েছিল; আমার নিরুপদ্রব অসহযোগ নীতি যে কতখানি প্রসার লাভ করল তা ভেবে আমার মনে গর্ব্ব অনুভব করেছিলাম; কিন্তু তখন একবার ভেবে দেখবারও প্রবৃত্তি হয়েছিল, এমন দুর্দ্দান্ত জাতটা একমুহূর্ত্তে এতটা নিরীহ হ'য়ে গেল কেন? দেখলাম আমারও যে দশা জার্ম্মাণিরও সেই দশা। প্রথম, আমার মত জার্ম্মাণি অহিফেন ধরিয়াছে, অর্থাৎ আমার মত জীবন সংগ্রামে হারিয়া যুদ্ধ করার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়, আমার মত তাহার সুবুদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ ঘটনাস্রোত যেদিকে বহিয়া চলিয়াছে তাহার উজানে গিয়া হাত পা ক্লান্ত করা নিষ্প্রয়োজন—টানে যেখানে লইয়া চলে চলুক—চেষ্টা করিয়া লাভ নাই—এই রকমের একটি খুব গভীর তত্ত্বজ্ঞানের বন্যা দেশটার একপ্রান্ত হইতে আর-একপ্রান্ত পর্য্যন্ত বহিয়া চলিয়াছে। তৃতীয়, আমার মত তা'র এখনও দুধে হাত পড়ে নাই, অর্থাৎ ঘরে ভাত যথেষ্ট আছে তাই "কে যায় সাগর পার", এই নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। চতুর্থ, আমার মত সে নখ-দন্তহীন হইয়া পড়িয়াছে; কালী-পূজার পাঁঠাবলিতে তা'র কোন ইষ্ট নাই, সে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। নখদন্তহীনের ধর্ম্ম নিরুপদ্রব অসহযোগ, তাই সে আজ নিরুপদ্রব অসহযোগী। অবশেষে, আমার মত পৃথিবীতে স্বর্গটা নামিয়া আসিবে এই বিশ্বাস জার্ম্মাণির হৃদয় অধিকার করিয়াছে। আফিম সেবনের যেটা পরম পরিণতি তাহাই ঘটিয়াছে।—

A day must come, asserted the Chancellor (Cuno), when honest agreement between equal nations would replace military dictation. He saw, as the

other side must see, that unarmed Germany could not be conquered by arms. Till then the Germans must endure.

এ কথা এক কমলাকান্ত ও কমলাকান্তধর্ম্মী পুরুষের মুখেই শোভা পায়। কেবল এক মন্ত্র কমলাকান্ত বিশ্বাস করে যে, সেদিন আসিবে যেদিন মানুষে মানুষে তফাৎ থাকিবে না,—সকলেই মৌতাতী হইবে। আর হাতিয়ার থাকিলেই মানুষকে বশ করা যায় না; নিরস্ত্রকে কাটিয়া ফেলা চলে কিন্তু conquer করা চলে না। তবে ভূতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত কমলাকান্তকে তথা তা'র মত নিরুপদ্রবীকে endure করিতে হইবে - অর্থাৎ সহ্য করিতে হইবে, এবং ধৈর্য্য ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কেন না, না বাঁচিয়া থাকিলে স্বর্গ নামিয়া আসিবে না, তাহাকেই স্বর্গে আরোহণ করিতে হইবে।

কিন্তু আমার মৌতাত যখন পাতলা হইয়া আসে, তখন আমার নিরেট অর্থাৎ জমাট বুদ্ধিটাও একটু তরল হইয়া পড়ে এবং সন্দেহ সুবুদ্ধির মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে জ্বালাতন করে; তাহার কোন প্রতিকার না করিতে পারিয়া আমি একমাত্র আফিম চড়াইয়া সে সন্দেহকে ঘুম পাড়াইয়া দি। সন্দেহটা এই—জার্ম্মাণি যে আমার অসহযোগনীতি গ্রহণ করিয়া আমাকে এবং নীতিটাকে ধন্য করিয়াছে সেটার শেষ পর্য্যন্ত মান রাখিবে ত? তা'র মান রাখিতে হইলে দুইটা কার্য্য করিতে হইবে; এক ফ্রান্সের দাবী শেষ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করা এবং শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্রধারণ না করা। কারণ ফ্রান্সের দাবী

গ্রাহ্য করিয়া একটা মিটমাট করিতে রাজি হইলে, অথবা অস্ত্রের মুখে ফ্রান্সের ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তর দিলে, অসহযোগ পণ্ড হইয়া গেল। মনে কর ঘরে চোর ঢুকিয়াছে, ঘটিই লউক, আর বাটিই লউক, আমাকে নিশ্চেষ্ট হইয়া চোরের সুপ্ত বিবেক যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ চুপ করিয়া নিদ্রার ভান করিয়া শুইয়া শুইয়া চোরকে আশীর্ব্বাদ করিতে হইবে, তবে আমি নিরুপদ্রব অসহযোগী। চোর চোর করিয়া চীৎকার করিয়া পাড়ার লোক ডাকিয়াছি কি (চোরের গলাটেপা ত দূরের কথা) আমার ধর্ম্মও গেল, জিনিষও গেল, চোরকে সাধু করাও হইল না! জার্ম্মাণি শেষটা সেই প্রকার ছেলেমানুষী করিয়া সব পণ্ড করিয়া ফেলিবে না ত ? মাঝে মাঝে Guerilla warfareএর ধুয়া তুলিতেছে, শেষে শত্রুর গায়ে সত্য সত্যই হাত তুলিয়া বসিবে না ত ?

আর যদিই বসে, নিরুপদ্রতার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার আমার অনেক পন্থা আছে, সেজন্য আমি ভাবি না। প্রথমেই আমি বলিব East is East and West is West, the twain shall never meet—সুবুদ্ধি হইয়াছিল তাই জার্ম্মাণি আমার আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু রাখিতে পারিবে কেন ? জার্ম্মাণি গরু খায়, শূয়র খায়, আমি চতুষ্পদের মধ্যে আর সব খাই বটে (অন্তত যতদিন দাঁত ছিল খাইতাম) কিন্তু ও দুটো বাদ ; আর দ্বিপদের মধ্যে যেটা সব চেয়ে জঘন্য, অর্থাৎ মুরগী, তাহা আমি স্পর্শ করি না, মুরগীর ডিমও খাই না, যদিও হাঁসের ডিমে আমার আপত্তি নাই। এ সব মৌলিক পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিতে যে কার্য্যের পার্থক্য হইবেই তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

১৩

যে হেতু আমরা ভাই ভাই

যে হেতু আমরা ভাই ভাই—রাঢ়ীর সঙ্গে বারেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ, মনের ভিতর বেশ তফাৎ করে' রেখেচি, যদিও মুখে খুব ভদ্রতা করে', অর্থাৎ চালাকি করে' বলি আমরা ভাই ভাই।

যে হেতু আমরা ভাই ভাই—ছত্রিশ জাতের খোপের ভিতর পুরে ভাইগুলিকে বেশ শ্রেণীবদ্ধ করে' রেখেচি; খোপের বা'র হ'য়ে ভাইটী আমার খোপের দিকে এসেছেন কি অমনি চঞ্চুর আঘাতে তাঁকে দূর করে' দিয়ে বলি—"খোপের মাহাত্ম্যটা না মানলে সমাজ ছড়িয়ে পড়বে, খোপটা আছে বলেই আমরা আছি, নহিলে কবে আমাদের এই পারাবত গোষ্ঠিকে বেরালে শেষ করে' দিত, অতএব খোপের বাহিরে আসিও না।" মাথার উপর যে বাধাহীন আকাশ বল্‌চে—আমি আছি, আমি বাধাহীন বলেই তোমরাও আছ, সে অশরীরী বাণী—খোপের ভিতরে বসে' শুনেও শুনচি না। ভাই ভাই এর জীবন স্রোতের অবাধ প্রবাহে যতকিছু বিঘ্ন সৃজন করতে পারি, তা বেশ বুদ্ধি করে' সৃজন করেচি—শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে তা'কে আষ্টেপিষ্টে শৃঙ্খলিত করেচি।

যে হেতু আমরা ভাই ভাই—বেহারী ভাই বরাকর নদীর পাড়ে

দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলচেন, প্রবেশ নিষেধ—Behar for the Beharees ; উড়িয়া ভাই বৈতরণীর তীরে দাঁড়িয়ে বলচেন—Orissa for the Oryas—আসামের ভাই সকল বলতে সুরু করেচেন—Assam for the Assamese. আমরা বাঙ্গালী এখনও মুখ ফুটে বলি নি—Bengal for the Bengalis, কিন্তু বল্লুম বলে আর দেরী নেই। অাঁতের কালি মুখে ফুটে বেরুবেই, কিন্তু সে সত্যকথা গোপন করে' তথাপি বলব—যেহেতু আমরা ভাই ভাই—

মুসলমান ভাই যখন Corporation বা Legislative council এ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের (Communal representation) আবদার করচে, তখন মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃবৎসলতার অভাব দেখে আর্ত্তনাদ করলে চলবে কেন ? বুকের উপর হাতটা দিয়ে একবার বুঝলেই বুঝা যাবে, যে ভাইএর এই আবদার অপেক্ষা গণতন্ত্রের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণের প্রকৃত কারণ কি! পেটের জ্বালায় মুসলমান ভাই যখন গোমাংস খাওয়া হ'তে বিরত হ'তে পারবে না, তখন তুমি হিন্দু ভাই, তার পেটের জ্বালাটাকে না মেনে, গোমাতার প্রতি অধিকতর স্নেহবান হ'য়ে, ভাইয়ের চেয়ে গরুকে অধিক ভালবাসলে, মুসলমান ভাই যদি বলে—রইল তোমার হিন্দু-মুসলমানের একতা, তা'তে অাঁতকে উঠলে চলবে কেন ? ভাইএর পেটের জ্বালায় প্রাণ কাঁদল না—যত দুঃখ গো-বধে। ভাইএর চেয়ে গরুর আদর, তথাপি বলবে—যে হেতু আমরা ভাই ভাই—

এ ভণ্ডামি, এ আত্মপ্রতারণায় কে প্রতারিত হবে ? রাজাও নয়, রাজরাজেশ্বরও নয়। অতএব অভিনয় ছাড়—এক সানকিতেই

খাও, আর বক্তৃতা-মঞ্চে পরস্পর জড়াজড়ি কর, এ অভিনয়ের নিদারুণ প্রায়শ্চিত্ত একদিন করতে হবে। ভাইএর প্রতি ভাইএর প্রকৃত মনোভাবটা লুকিয়ে রাখচ, কেবল স্পষ্ট করে' ব্যক্ত করবার সাহস নেই বলে' ত? আমি বলি এটা একটা উৎকট ব্যাধি; রোগ চাপলে মজ্জায় গিয়ে পৌঁছায়; রোগের স্বচ্ছন্দ বিকাশ হ'তে দাও—হয় রোগ যাবে, নয় রোগী যাবে। কিন্তু চেপে রাখলে রোগীকে রক্ষা করে ধন্বন্তরীরও সাধ্য নাই। নয়ত সুচিকিৎসক ডাক, সময় থাকতে ডাক, যদি উপায় হয়।

এই বিপুল বৈচিত্র্যময় দেশের অতীত ইতিহাসে ভাই ভাইএর মিলন ঘটাবার বহুবার চেষ্টা হ'য়ে গেছে। একজন বলেচেন—"আমার ভাই হবে ত হও, নইলে তোমায় কতল করব।" বলা বাহুল্য তা'তে ভাই ভাইএ মিলন হয় নি। আর-একজন বলেচেন—"আমার এই ছত্রিশ খোপের দরজা খুলে দিলাম, যে আসতে চাও এস, এ ছত্রিশ খোপের একটা খোপে তোমার স্থান করে' দেব।" তা'তেও সে ছত্রিশ কর্ত্তে ছত্রিশই র'য়ে গেছে, ভাই ভাইএ মিল হয় নি।

আমি বৃদ্ধ কমলাকান্ত ঠিক খোলসা করে' বুঝে উঠতে পারচি না কি করলে, এ ভাই ভাইএর বিরোধজনিত যে পাপ তা'র প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি বৃদ্ধ আমি ভীতু, যুবা যে সে নির্ভীক; যুবা বলবে ভয় কি? আমি বল্‌ব ভরসা কিসের? যৌবনের রোগ বড়কে ছোট করা; বার্দ্ধক্যের রোগ ছোটকে বড় করা; দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত জঞ্জাল, যৌবন এক ফুৎকারে উড়িয়ে

দেবে; বার্দ্ধক্য চুল চিরে দেখবে, সাবধানে পা ফেলবে, একটা কাঁকর পায়ে ঠেকলে চমকে উঠবে; যৌবনের ব্যাধি দুরাশা, বার্দ্ধক্যের ব্যাধি নৈরাশ্য; যৌবনের ব্যাধি বন্ধনহীন স্বাচ্ছন্দ্য, বার্দ্ধক্যের ব্যাধি শাস্ত্র; যৌবনের খরস্রোত পাহাড় কেটে তীর বেগে ছোটে, বার্দ্ধক্যের মন্থর গতি, পথশ্রান্ত হ'য়ে সমতল ক্ষেত্রে শতধারায় বিভক্ত হ'য়ে সাগরে মিশিয়ে গিয়ে বাঁচে।

অতএব এস যৌবন, এস রাজপুত্র, এস ভিখারী, এস জ্ঞান, এস মমতা, তোমাকে আমি এ ভারতভূমির মহিমাময় যুগে দেখেছি, আবার তোমার আগমন প্রতীক্ষা করে' বসে আছি—এস, এস। ভাইএর সঙ্গে ভাইএর মিলন ঘটিয়ে দাও—কারণ আমরা যে সত্যই ভাই ভাই। ভয়ঙ্করের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভীত ভীতের হাত ধরে' ভরসা পায়, নির্য্যাতনের চোটে মানুষে মানুষে মিল হয়, উদরের জ্বালায় লোকে এক জোট হয়; কিন্তু যেমন ভয়ের কারণ দূরে যায়, নির্য্যাতনের জ্বালা প্রশমিত হয়, উদরের জ্বালা নেভে, তখন আর কেউ কা'কেও চেনে না, তখন আবার মানুষ নিজ মূর্ত্তি ধরে, মুখে বলে ভাই ভাই, মনে মনে ছুরি চোকাতে থাকে। তাই ডাকছি তোমাকে, হে রাজপুত্র! তুমি যে জ্ঞান যে মমতা নিয়ে মানুষের ভিতর সুধু মানুষটাকে দেখেছিলে দেখিয়ে দিয়েছিলে—যে জ্ঞানের মহিমায় জাতি বর্ণ দেশ কাল সব ভুলে গিয়ে, মানুষ আপনার মানুষত্ব ফুটিয়ে তুলেছিল - সেই জ্ঞান ও মমতা নিয়ে, হে রাজপুত্র, হে ভিখারী, আর একবার এসো, এসো; দেখিয়ে দাও আমরা সত্যই ভাই ভাই।

১৪

সাবধান !

[ফরাসডাঙ্গার গৌর-বিল প্রতিবাদের আড্ডায় পঠিত]

যে হেতু এই সভায় স্বাধ্যায়ী চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহারও উপস্থিতি প্রার্থনীয় নহে, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, অহিফেনসেবী হইলেও, সনাতন ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী বলিয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিবার অধিকারী বিধায়, সশরীরে উপস্থিত হইতে অপরাগ হওয়ায়, পত্র দ্বারা আমার বক্তব্য বলিয়া পাঠাইলাম, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

আদাবান্তে চ মধ্যে চ, আমার মূল কথা আমি গৌরবিলের একান্ত বিরোধী; এবং এ সভায় বাদী অথবা তদীয় অলি অছি উপস্থিত না থাকিলেও, বিচার কার্য্য এক তরফাও যখন হইবার আইন আছে, আমি একজন প্রতিবাদী হইয়া আমার বক্তব্য আপনাদিগের নিকট পেশ করিতেছি; আপনারা বিচারকর্ত্তা, ডিক্রী ডিস্‌মিস্ যদ্রোচতে তৎক্রিয়তাম্। বাদী যথাকালে ছানি করিতে পারেন, যদি তাঁর অভিরুচি হয়। অতএব এক তরফায় দোষোনাস্তি।

আমার এই গৌরবিলের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি—এ গৌর কে? তা'র পরিচয় কি? অজ্ঞাতকুলশীলস্যামলং দেয়ো ন কস্যচিৎ,

অর্থাৎ অজ্ঞাতকুলশীলকে কখনও আমল দিবে না, এই শাস্ত্রবচনাৎ— প্রথমেই অনুসন্ধান করে' দেখা উচিত এ গৌর কে? ইনি কি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র গৌর, যিনি নদীয়ায় পূর্ণচন্দ্ররূপে উদিত হ'য়ে আচণ্ডাল মুসলমানে পর্য্যন্ত প্রেম বিলিয়েছিলেন? না, তিনি নন নিশ্চয়; যেহেতু নদীয়ার চাঁদ দিল্লীতে উদিত হয়েছিলেন তস্য প্রমাণাভাবাৎ। তবে ইনি কে? আমরা কেহই "তাঁরে চোখে দেখিনি, স্বধু বাঁশী শুনেছি," অর্থাৎ তাঁর বক্তৃতা পড়েছি; আরও শুনেছি "সে থাকে গোকুলে", অর্থাৎ Legislative Councilএ, যথায় বহু গো-কুল একত্র হয়েছেন। অতএব অপরিচিত ব্যক্তিকে কোন মতেই আমল দেওয়া উচিত নহে।

কিন্তু নদীয়ার গৌরচন্দ্রের সহিত এই গৌরের নামের সাদৃশ্য ছাড়া আর একটু সাদৃশ্য লক্ষিত হচ্চে, যার জন্য তাঁর রচিত বা উদ্ভাবিত বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদটা খুব তীব্র হওয়া উচিত। নদীয়ার গৌরচন্দ্র প্রেম বিলিয়েছিলেন যা'কে তা'কে; যে চেয়েচে সেই পেয়েচে, যে চায় নি সে'ও পেয়েচে। এমন দো-চোকো ব্রত করে' হয়েছিল—এলাহি কারখানা; হিন্দু মুসলমান সব এক গাড়ে হ'য়ে গিয়েছিল, হিন্দু ধর্ম্মের মূল যে 'জাত' তা কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল, তা'র ঠিকানা ছিল না, নেড়ানেড়ির সৃষ্টি হয়েছিল। নাগপুরী গৌরেরও মতলব ভাল নয়, ঐ রকম এলাহি কারখানা করবার একটা মতলব তাঁর বিলের ভিতর প্রচ্ছন্ন আছে। বিলের বক্তব্যটা ঠিক আমার জানা নেই, জানবার দরকারও নেই, কিন্তু জাতটাত আর থাকবে না, যে যা'কে পাবে ধরে' ধরে' বিয়ে করবে, এই

রকম একটা জঘন্য ব্যাপার ঘটবে শুনচি, অতএব বিলের বিরুদ্ধে আমি Protest কল্লাম।

আর একবার জাতের মাথা খেয়ে ছিলেন বুদ্ধদেব, যিনি আমাদের দশ অবতারের এক অবতার। বুদ্ধদেব লোকটা বড় জবরদস্ত ছিলেন,—হাজার হোক রাজার ছেলে ত! চাতুর্ব্বর্ণ্য নষ্ট করে' দেশটার খুব উন্নতি হয়েছিল শুনিচি; কিন্তু ধর্ম্মটা একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল। দেশ উন্নত হ'য়ে ত কোন লাভ নেই, ধর্ম্ম নষ্ট হ'লে যে পরকাল নষ্ট হ'ল, তা'র হিসাব ত কেউ রাখে নি! তাই শঙ্করাচার্য্যের উদ্ভব হ'ল; তিনি আবার নষ্ট জাত উদ্ধার কল্লেন; হিন্দু ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম বাপ্ বাপ্ করে' "চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপানে" গিয়ে আশ্রয় নিলে; যে যে দেশে বিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম্ম গিয়ে আশ্রয় নিলে, সেগুলো আজ পর্য্যন্ত স্বাধীন, (ব্রহ্মদেশ মাত্র কাল পরাধীন হয়েচে) আর আমরা হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'বার পর থেকেই লাথির পর লাথি, আর জুতার পর জুতা খাচ্চি; কিন্তু বদ্ধ জীব আমরা, আমাদের বুঝা উচিত, আমাদের পরকালটা কি রকম পাকা হ'য়ে গেছে, আর ইহকালে কি অমূল্য নিধি আমরা লাভ করেচি—'চাতুর্ব্বর্ণ্যের" স্থলে আমরা "ছাত্রিশবর্ণ্য" পেয়েছি; এই "ছাত্রিশবর্ণ্য"টা যে নষ্ট করবে তা'র বুদ্ধদেবের ন'গুণ পাপ হবে,—(চার নয় ছত্রিশ) যে রক্ষা করবে তা'র শঙ্করাচার্য্যের ন'গুণ পুণ্য হ'বে; দেশটা উচ্ছন্ন যাবে তা'র জন্য ভাবলে চলবে না, (ইহলোকের খেলা আর ক'দিন?) আমাদের পরকালটা যে

ন'গুণ উজ্জ্বল হবে সেটা ভুললে চলবে না।

এই "ছাত্রিশবর্ণা"টাকে রক্ষা কি করে' করা যায় "প্রশ্ন ইহাই এখন"। প্রশ্ন বড়ই সঙ্গীন; কেন না ম্লেচ্ছ শিক্ষা ও সংস্কারের সংস্পর্শে এসে অবধি আমাদের সনাতন শিক্ষা-সংস্কার কি রকম আমাদের অজ্ঞাতসারে যে বদলে যাচ্ছে তা একটু প্রণিধান করে' দেখলেই বুঝা যাবে।

প্রথমতঃ, ভূদেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি কি রকম শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে পড়েচে লোকে? অথচ এককালে ব্রাহ্মণের পদাঘাত বুকে ধারণ করেছিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সে ব্রাহ্মণ ঠিক একালের ব্রাহ্মণের মত নয় হয়ত; কিন্তু ব্রাহ্মণের আবার রকমফের কি? ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ, গলায়-পৈতে বামুন নয়, সে ত একটা হেঁয়ালীর কথা! ম্লেচ্ছ-সংস্কার বশতঃ শূদ্র আবার ব্রাহ্মণের জাতি-বিচার করতে বসেচে, এর চেয়ে অধঃপতন কি হ'তে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, গুরুপুরোহিতের প্রতি অশ্রদ্ধা। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে why and wherefore জিজ্ঞাসা করতে শিখে, গুরু-পুরোহিতের আর সে আদর নাই; "গুরুগ্‌গাঁই" ত উঠেই গেছে, গুরু-পুরোহিতের স্থধু নিজ নিজ ব্যবসায়ে আর পেট ভরে না; তাঁদের "আরও আরও কার্য্য" কর্ত্তে হচ্ছে। কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন!

তৃতীয়তঃ, দেশে বহুবিবাহরূপ কন্যাদায় প্রশ্নের যে সুন্দর সমীচীন মীমাংসাটা অনাদি কাল থেকে চলে' আসছিল, ম্লেচ্ছ সংস্কারের তাড়নায়, তা'র বিরুদ্ধে লোকমত বলে' একটা মত খাড়া করে', তা'কে নষ্ট করা হয়েছে। উচিত ছিল, বহু বিবাহটা কুলীন

ব্রাহ্মণের মধ্যে বজায় রাখা, উপরন্তু সকল জাতের মধ্যে প্রসার করে' দেওয়া; তা'তে কুলীনের ছেলের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হ'য়ে যেত বটে, কিন্তু সমাজের কি উপকারটা না হ'ত? এক একটি পুরুষের ডজন ডজন স্ত্রীর ব্যবস্থা থাকলে, এতদিন কন্যার বিবাহ problemটা solve হ'য়ে যেত, আর এই আক্রাগণ্ডার দিনে স্বামীগণের এক একটা ছোট খাটো জমীদারির ব্যবস্থা হ'য়ে যেত। ম্লেচ্ছ-সংস্কারের ফলে সে শুভ ব্যবস্থা হ'তে পেলে না!

এ ত গেল প্রচ্ছন্ন আক্রমণ, surreptitious attacks. খোলাখুলি রকমে তিন তিন বার হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ আক্রান্ত হয়েছে; একবার হয়েছে, যখন আইন করে' সতীদাহ উঠিয়ে দেওয়া হয়; সেই অবধি ভারতে সতীধর্ম্ম একরকম উঠে গেছে বল্লেই হয়; এখন যা আছে সব জাঁকড়ে সতী, কেন না রাং কি সোনা পুড়িয়ে যাচাই করে' নেবার ত উপায় নেই; এটা কি সমাজের কম ক্ষতি!

তারপর বিধবা-বিবাহ বিধি; এ কি কম সর্ব্বনাশের কথা? সতীদাহ ত বন্ধ, তারপর গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্, সতীর পুনশ্চবিবাহ-ব্যবস্থা! এতে হিন্দু সমাজের উচ্ছন্ন যাবার আর কি বাকি রইল?

তারপর সম্মতি আইন; রজঃস্বলা হবামাত্রই হিন্দুধর্ম্মমতে গর্ভাধান করতে হ'বে। শাস্ত্র বল্‌চেন, প্রকৃতি বল্‌চে, স্ত্রী প্রথম ঋতুমতী হ'বামাত্র গর্ভাধান কর, তা' স্ত্রীর বয়স ১০ই হ'ক, আর ১১ই হ'ক, আর ১২ই হ'ক; কিন্তু আইন তা করতে দেবে না। ফল হয়েছে এই যে, ঠিক শাস্ত্রমত ছেলে না হওয়ায়, যত অকালকুষ্মাণ্ডের জন্ম হচ্ছে।

বার বার তিন বার! আর নয়। ম্লেচ্ছ রাজা, ম্লেচ্ছ বা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন রাজদরবার, সে রাজা বা রাজদরবারের কি অধিকার আমাদের সামাজিক-জীবনের বা ধর্ম্ম-জীবনের উপর হাত দেয়? হ'লই বা আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি! জাত গেলে ধর্ম্ম কোথা থাকে? সেই জাত পাকে-প্রকারে তুলে দেবার ব্যবস্থা হয়েচে! কেহ বলবেন, এতে সমাজের উপকারই হবে; হয়ত হবে, কিন্তু জাত যাবে যে, ধর্ম্ম যাবে যে, পরকাল যাবে যে, তা'র কথা কে ভাবচে? আপনারা ভাবচেন, আর আমি কমলাকান্ত ভাবচি, তাই ভরসা! থাক্ ধর্ম্ম যাক্ প্রাণ। বার বার তিন বার হ'য়ে গেছে, বস্, আর না, আমরা গৌরের বিল চাই না। এ সময় যদি আমরা আল্‌গা দিই, বার বার চার বার হবে, তারপর আর ঠেকান যাবে না, সমাজ গড়ের মাঠ হ'য়ে যাবে, কোন বাচবিচার থাকবে না, আবার বুদ্ধ চৈতন্যের যুগ ফিরে আসবে, তা হ'লে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব থাকবে না, অতএব হিন্দুধর্ম্মও থাকবে না—সাবধান!

১৫

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞানে মোক্ষ, বিজ্ঞানে ভবযন্ত্রণার পরিসমাপ্তি; বিজ্ঞানে সাজুয্য, সালোক্য ইত্যাদি পরলোকের পারিতোষিক মিলে; কিন্তু ইহলোকে সুধু বিজ্ঞানে বড় সুবিধা হয় না। ইহলোকের দেবতাগণের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্তির জন্য, বিজ্ঞানের উপর বিজ্ঞাপনের বাহার চড়াতে হয়; বিজ্ঞান না থাকলে সে বাহার আরও একটু খোলতাই করে' দিতে হয়, তা হ'লেই সাজুয্য বা সালোক্য মিলতে পারে—যেহেতু স্বর্গের দেবতা অন্তর্যামী, ইহলোকের উপরওয়ালারা অন্তর্যামী ত নহেনই, বরং তাঁরা জেগে ঘুমান। চোখে আঙ্গুল না দিলে তাঁদের ঘুম ভাঙ্গে না—এই চোখে আঙ্গুল দেওয়ার নামই বিজ্ঞাপন।

নীলকমল পাগল, তাই বলেছিল যে, তা'র অধিকারী মহাশয় তা'র গুণের আদর করেন বলে' তা'কে আদর করে' ১০ টাকা মাইনে করে' দিতে চেয়েছিলেন। গুণ অনেকেরই আছে, কিন্তু অধিকারী মহাশয়েরা পারত-পক্ষে তা' স্বীকার করতে প্রস্তুত নন, আদর করা তো চুলোয় যাক। এই জীবন-রঙ্গমঞ্চে অনেক নটেরই কিছু-না-কিছু গুণপনা আছেই আছে, বা গুণের খোশনাম আছে; কিন্তু

অধিকারী মহাশয় তা বুঝেন না। গুণ থাকলেই গুণের খোশনাম থাকে না;—অনেকে মদ না খেয়ে মাতাল, আফিম না খেয়ে মৌতাতী, ধন না থেকেও ধনাপবাদগ্রস্ত; গুণ থাকতেও অনেকের "কোন গুণ নাই, তা'র কপালে আগুন।"

অন্তর্যামী জানলেই হ'ল, আর কেহ জানল আর না জানল যাদের একই কথা, সে পরকালগ্রস্ত খেয়ালীদের কথা ছেড়ে দিলাম। যারা নটরাজ মানেন না, অধিকারী মহাশয়কেই মানেন, তাঁদের সুবিধার জন্য গোটাকতক সদুপদেশ আমি মৌজের মাথায় বলে' যাচ্ছি শ্রবণ কর। কবি বলেচেন—Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. এই তৃতীয় শ্রেণীর greatness কি উপায়ে লাভ করা যায়, আমি তা'র কতকগুলি মুষ্টিযোগ বলব মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যারা great না হয়েও great হ'তে চায়, এবং যারা চায় না, উভয় শ্রেণীর লোকেরই উপকার হবে।

বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে শতকরা ৯৯ জনের বড় হওয়া না-হওয়া বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে। কবি বলেছেন—Sweet are the uses of adversity, কিন্তু আমি বলি,—Sweeter are the uses of advertisement. বিজ্ঞাপন আর hypnotism একই মূল সূত্রের উপর অবস্থিত। ঘুমাও-ঘুমাও-ঘুমাও পুনঃপুনঃ বলতে বলতে হাতচালা দিয়ে যেমন hypnotiser ঘুম পাড়ায়, কানের কাছে কেবল ঘুম, আর ঘুম, আর ঘুম, ঘুমন্ত স্বরে ধ্বনিত হ'তে হ'তে যেমন সত্যই ঘুম আসে—ঘাটে মাঠে পথে আকাশে

বাতাসে কেবল তোমার গুণের কথা, তোমার রূপের কথা, তোমার ঐশ্বর্য্যের কথা, তোমার দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা, তোমার শৌর্য্যের কথা, তোমার লেখনীচাতুর্য্যের কথা—তুমি যেটাকে ফুটিয়ে তুলতে চাও,—ক্রমাগত চিত্রিত, বিচিত্রিত, গীত, পঠিত, ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত করতে থাক, স্বল্প কালেই তোমার খোশনাম অল্পবিস্তর জাহির হবেই হবে। কথায় বলে, throw dirt and some will stick ; আমি বলি, throw praise and some will stick ; আর একবার লাগলে আর ভাবনা নেই ; তার উপর প্রলেপ দিতে থাক,—একমেটে, দোমেটে, তেমেটে, তারপর রং ফলিয়ে চোখ চান্‌কে নাও।

কিন্তু এ কাজ করবে কে? এ ছিটেন, এ খোশনামের broad-casting করবে কে? এ আঁকন আঁকবে কে? এ গান গইবে কে? আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে যে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করবার বিধি আছে সেটা অতিবড় ভাগ্যবানের জন্যই ; এ ঐহিক কল্যাণের জন্যও নিজের শ্রাদ্ধ নিজেকেই করতে হবে, নিজের গান নিজেকেই গাইতে হবে, নিজের চিত্র নিজেকেই চিত্রিত করতে হবে।

আত্মপ্রশংসার তীব্র সুরা বিনয়ের জল মিশিয়ে "পান্তাভাত" করলে চল্‌বে না ; বিনয়ের যেখানে প্রয়োজন তা পরে বল্‌চি, কিন্তু এ নাটকের প্রথম অঙ্কে অতিরঞ্জনের আতঙ্কটাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হবে ; তম ও ইষ্ঠ প্রত্যয়ের ছড়াছড়ি করে' দিতে হবে—superlativeএর বন্যা বহিয়ে দিতে হবে। কারণ এ আজব

দুনিয়া—বাধ্য না করলে কেউ কখনও আপনার দোষ, আর পরের গুণ স্বীকার করবে না, বিজ্ঞাপনের তোড়ে সব resistance ভেসে যাবে; আর একবার সুর ধরিয়ে দিতে পারলে, দোহারের অভাব হবে না, সত্বর আসর জমজমাট হ'য়ে উঠবে।

অতএব তুমি যাই কর, বা কিছু নাই কর, কলমটি নিয়ে বস, এবং নিজের হাতে একটি সুরচিত para লেখ—তুমি কতবড় বীর, বা কতবড় সাধু, বা কতবড় পণ্ডিত, তা' বেশ স্পষ্ট করে' বলে' দাও, এবং অপরের নাম দিয়ে সে paraটি সংবাদ পত্রে পাঠিয়ে দাও। সংবাদ পত্রের authentic মানে একটা নাম আর ঠিকানা, সুতরাং সে authenticity দেবার ভাবনা নেই; তোমারই রচিত para তোমার গুণ দুনিয়ায় ছিটিয়ে দেবে, এবং কোন-না-কোন উর্ব্বর ক্ষেত্রে সে বীজ পড়ে' অঙ্কুরিত হবে, পল্লবিত হ'য়ে উঠবে। একজন খোসামুদে কোন লোহার কার্ত্তিক বাবু সম্বন্ধে বলেছিল—"বাবুর রংটা শ্যামবর্ণ হ'লে কি হয়, রংএর জলুস কি রকম!"—এইখানেই advertisementএর মূল তত্ত্ব ব্যক্ত হ'য়ে পড়েছে; এই রংএর জলুসটাই বিজ্ঞাপনের আখ্যান বস্তু, শ্যামলিমা নয়। তোমার সকল চাটুকারের মূল চাটুকার তুমি স্বয়ং, তুমি যেমন তোমার খোসামোদ করতে পার, এমনটি আর কেউ পারে না; সুতরাং তোমাকেই চাটুকারের চটুল বাক্যের ফোয়ারা ছুটাতে হবে, তোমার শ্রাদ্ধ তোমাকেই করতে হবে। চক্ষুলজ্জা করলে চলবে না; আর সংবাদ পত্রের সম্পাদকের সঙ্গে তোমার চোখাচোখি যে হবেই তা'র ত কোন কথা নেই, অতএব চক্ষুলজ্জা কিসের?

মনে রাখবে এ যজ্ঞে, তোমার বকলম ঋষি, তুমি দেবতা, ও "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" মন্ত্র।

একজন নাচতে জানত, কিন্তু লোকে জানত না যে সে নাচতে জানে; তা'র শুভানুধ্যায়ী বন্ধু একজন তা'কে বল্‌লে—Wherefore are these things hid? Wherefore have these gifts a curtain before them? Why dost thou not go to church in a galliard and come home in a coranto? Is it a world to hide virtues in? এ উপদেশ অমূল্য; নাচতে নাচতে গির্জ্জায় যাওয়াটা হয়ত শোভন নয়, কিন্তু শোভন অশোভন অত বিচার করতে গেলে, গুণের প্রচার কি করে' হয়?

প্রচারের আর একটা পন্থা আছে—সেটা একটু বাঁকা; যখন সোজা আঙ্গুলে ঘি বা'র হয় না, তখন আঙ্গুলটাকে বাঁকানর বিধি আছে; এও সেই প্রকার। সোজাসুজি উপায়ে যখন লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল না, তখন কবি বলেছেন—put thyself into the trick of singularity—অর্থাৎ যদি বাঁ দিকে টেরী কাটা চলতি ফ্যাসান হয়, ত তুমি কাটবে ডান দিকে; যদি টিকি রাখা রেয়াজ হয়, তুমি টিকি কেটে ফেল্‌বে; চা খাওয়া প্রথা হ'লে তুমি চা ছেড়ে দেবে, and vice versa; দেখবে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ হবেই হবে, লোকে বলবে—লোকটার চিন্তার, চরিত্রের বিশিষ্টতা আছে—independence of character আছে। কিন্তু independence কথাটায় বড় চড়া গন্ধ, অনেকের নাকে সহ্য হয় না, অতএব

এপথে একটু বিপদও আছে। মোটকথা তবে, এই singularity যদি গড্ডলিকা প্রবাহের অনুকূল স্রোত ধরে' চলে তা হ'লে বিপদ খুব কম, যথা—বিলাত প্রত্যাগত হ'য়েও যদি মুরগী না খাও, ডাক্তারী বিদ্যা শিখেও যদি মাদুলির মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, Astronomy পড়েও যদি 'মঘার' আঘাতে ভয় কর, নিজে সাহেব সেজেও যদি গৃহিণীকে পর্দ্দার ভেতর পুরে রাখ, তা হ'লে এ trick of singularityতে তোমার মৌলিকত্ব, তোমার বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় প্রদান করবে ; কারণ কুসংস্কার ত্যাগে ও কুসংস্কার পোষণে উভয়ত্রই মৌলিকত্ব থাকতে পারে।

এর চেয়ে বিজ্ঞাপনের আর একটা সহজ ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ উপায় হচ্ছে, কোন উদীয়মান জ্যোতিষ্কের উপগ্রহ-রূপ ধারণ করা ; তা'র এ ধার-করা, আলোয় উজ্জ্বল হওয়ার একটু-নিগ্রহের সম্ভাবনাও আছে,—জ্যোতিষ্ক নিষ্প্রভ হ'য়ে গেলে, নিজেকেও নিষ্প্রভ হ'য়ে যেতে হবে। অতএব একটু বুদ্ধি করে' বস্তু চিনে নিতে হবে ; আর যদি ভুলই হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে নিভবার আগে যখন প্রদীপ হাসতে থাকবে, সেই সময়ে তা'কে পরিত্যাগ করে' অপর কোন উদীয়মান নক্ষত্রের অন্বেষণে ফিরতে হবে ; সেখানে কিছু মমতা করলে চলবে না, কেননা যে দেশের ও দশের মাঝে একজন হ'তে চায়, তা'র মমতা বা চক্ষুলজ্জা প্রভৃতি বালাই থাকলে চলবে না।

এইবার বিনয়ের নানা ভঙ্গীর কথা বল্‌ব।

একবার গুণ জাহির হ'য়ে গেলে, অর্থাৎ আমার এই মুষ্টিযোগটা

লাগলে, তারপর বিনয় কাজে লাগতে পারে; যখন লোকে তোমারি প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে গড়চে, তোমারি ছবি টাঙ্গাচ্ছে, তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করচে (হয়ত তোমারই ব্যবস্থামত), তখন তুমি খুব বিনয়ী হ'য়ে বলবে—হাত দুটা কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে, ঘাড় নুইয়ে, ভূমি-সংলগ্ন দৃষ্টি হ'য়ে—"আপনাদেরই কৃপা, আমি অতি অকিঞ্চন, এটা আমাকে সম্বর্দ্ধনা করচেন না, আমায় উপলক্ষ করে' আপনারা আমার জাতকে, আমার সম্প্রদায়কে, আমার professionকেই সম্বর্দ্ধনা করচেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাত দেবতার পশ্চাদ্ভাগ দগ্ধ করে' সুদূর আমেরিকা থেকে বা home থেকে লম্বা খেতাব 'জুগাড়' করে' আনিয়ে, সেটা ব্যবহার না করায়, পরম পবিত্র বিনয় প্রকাশ পায়; আজকাল খেতাব পরিত্যাগে কিছু সম্মান বেশী; একেবারে পরিত্যাগ যদি নাও করতে পার, খেতাবটা ব্যবহার না করে' যদি বল—"আমি অতবড় খেতাবের উপযুক্ত নই"—খেতাবটা ব্যবহার করার চেয়ে বেশী মান অর্জ্জন করবে।

যদি তুমি লেখক হও, অর্থাৎ বই লিখে ছাপিয়ে থাক—নিজের নাম সই-করা ভূমিকায় বিনয়ের বন্যা বহিয়ে দিয়ে—প্রকাশকের নাম দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পিটতে পার, এও এক রকম বিনয়। আর একরকম বিনয়, চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে ভোজ দিয়ে গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে অতিথিগণের সমক্ষে বলা—'বিদুরের খুদ, কিছু মনে করবেন না'; অথবা বৈদ্যনাথ কি সিমুলতলায়, দুতলা বাড়ী তৈরী করে' মর্ম্মরে মুড়ে দিয়ে, দরজায় মর্ম্মর-ফলকে লিখে দেওয়া

—'নন্দন কুটির'। এই রকম বিবিধ ক্ষেত্রে তোমার সুনামের সোনায় বিনয় সোহাগার কাজ করবে। একেই বলে 'বড় হবি তো ছোট হ', অর্থাৎ ছোট হওয়ার ভান কর ; তা না করে', সত্য সত্য ছোট হলেই ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।—ইতি বিজ্ঞান-বিজ্ঞাপন-মাহাত্ম্য-কথা।

১৬

ঐহিক ও পারত্রিক

এই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, সুখদুঃখের আলো-আঁধারে দিশেহারা, আশা-নিরাশার নাগর-দোলায় দোলায়মান মনুষ্য-জীবন শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে যখন অবসন্ন হ'য়ে যায়, আন্তরিক চেষ্টার ফসল যখন ফলে না, আন্তরিক স্নেহ-ভক্তির যখন প্রতিদান মিলে না, সুচিন্তিত কার্য্যশৃঙ্খলা যখন অর্দ্ধপথে কোন অপরিজ্ঞাত কারণে ছিন্ন হ'য়ে যায়, মানুষ তখন হালে পানি না পেয়ে, এই দুস্তর ভবসিন্ধু পারে এক সুখরাজ্যের কল্পনা করে' ধৈর্য্য ধরে' থাকে—যে সুখরাজ্যে তা'র সকল অতীত চেষ্টার ফল থরে থরে সাজান আছে, ইহজীবনে সকল ব্যর্থতা যেখানে সার্থক হ'য়ে উঠবে, প্রত্যেক স্নেহবিন্দুর প্রতিদান মিলবে, এ জীবন-মরুভূমির সকল উত্তাপ, সকল নীরসতা অপগত হ'য়ে যেখানে সুধু শান্তি, স্বস্তি, চরিতার্থতা, সৌন্দর্য্য চির-বিরাজমান থাকবে।

স্বর্গের কল্পনাটাই আমার ছেলে-ভুলান "রূপকথা" বলে' মনে হয়, তা সে কল্পনাময় সুখস্থানকে—Atlantis বল, Heaven বল, Empyrian বল, Valhalla বল, বেহেস্ত বল, আর বৈকুণ্ঠই বল। বয়স হ'লেও মানুষ শিশুই থাকে; রোরুদ্যমান ছেলের হাতে পিটে

দিলে সে যেমন শান্ত হয়, জীবনের কষাঘাতে দীর্ণ-পৃষ্ঠ মানুষ স্বর্গরূপ মোয়া হাতে পাবার আশ্বাস মাত্র পেয়েই, তেমনই শান্ত পরিতৃপ্ত হয়। এ জীবনের কষাঘাত সে বড় আশায় বুক বেঁধে সহ্য করে' যায়। আইনতঃ ১৮ বছর বয়স হ'লে মানুষ সাবালক হয়, কিন্তু আমি দেখচি মানুষ as such আজ পর্য্যন্ত সাবালক হয় নি। কারও কারও মতে নাবালক থাকাটাই মনুষ্যত্ব; আর সাবালক হওয়াই মনুষ্যত্বের বিকার; জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়াটা যে মানব-গোষ্ঠীর আদি পুরুষের প্রথম ও প্রধান অপরাধ বলা হয়েছে, সে গল্পের মূলে এই তত্ত্বই নিহিত রয়েচে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন যুগের, ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বর্গের কল্পনা, সেই সেই দেশ, ও যুগ, ও জাতির বিশিষ্টতা নিয়ে রচিত। কিন্তু একটু প্রণিধান করে' দেখলেই বুঝা যাবে যে, সকল স্বর্গের কল্পনাই যার যেখানে ব্যথা—যে ব্যথার আর প্রতীকার হল না, বা যার যেখানে আনন্দ,—যে আনন্দের সমাপ্তি মানুষ চায় না, তা'র কল্পিত স্বর্গে সে ব্যথার অবসান, আর সে আনন্দের অফুরন্ত আয়োজন। ঐহিক জীবনের শেষ হয়, মানুষ মরে—স্বর্গে মানুষ দেবতা হ'য়ে যায়, মরণের অতীত হয়। দিনরাত খেটে খেটে মানুষ পেটের অন্ন সংগ্রহ করতে পারে না—স্বর্গরাজ্যে আহারের মোটেই অভাব নেই। এ জীবনে পরস্পর দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতা কলহ, এই অন্ন নিয়ে,—স্বর্গরাজ্যে সে অন্ন-সমস্যার সমীচীন মীমাংসা হ'য়ে গেছে, অমৃত ভাণ্ড অফুরন্ত, পান করবামাত্র পরিতৃপ্তি, সুতরাং প্রতিযোগিতা নেই, দ্বেষ নেই, হিংসা নেই। এ জীবনে ছোট বড়,

যুবা বৃদ্ধ সুরূপ কুরূপ, ধনী দরিদ্র, কত রকমের পার্থক্য, কত প্রকার শ্রেণীবিভাগ—স্বর্গে সব সমান, সব একাকার,—সব সুন্দর, সব যুবা, সকলেই রক্তাম্বর-পরিহিত, চতুরস্র।

দুঃখের বিষয় কেউ স্বর্গ হ'তে ফিরে এসে সে দেশটার first-hand পরিচয় দেয় নি! আমি আফিমের (যে দিব্যবস্তুটা অমৃত বা ambrosiaরই পার্থিব সংস্করণ) মৌজে কতবার "অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী" পার হ'য়ে সে দিব্যদেশে গিয়েছি—মৌজ ফুরালে আবার ফিরে এসেছি। আমি কিন্তু সে দেশের খুব বেশী সুখ্যাতি করতে পারলুম না। দেশটা বড়ই একঘেয়ে। দেশটা খুব তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, কোথাও মলামাটি নেই, কোথাও একটু হেলাগোছা নেই—যেন একটা খুব বড় রকমের Whiteaway Laidlawর দোকান—সেখানে যেন সদাই মৌজ—সেখানে খোঁয়ারির হাই উঠে না—সদাই ভরপুর নেশা। খানিকক্ষণ থাকতে ভাল, কিন্তু শীঘ্রই অরুচি জন্মে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসাটা মন্দ নয় কিন্তু বেশী দিন থাকা চলে না—অনন্ত জীবনের কথা ত দূরে! আমি যতবার গেছি, কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসতে পথ পাই নি। আমার এই বিচিত্র, সুখে দুঃখে বিজড়িত, মলামাটি মাখা,—কষ্টের মধ্যে সুখের, অভাবের মধ্যে পূর্ণতার, অসাফল্যের মধ্যে সাফল্যের, খোঁয়ারীর মধ্যে মৌতাতের, সম্ভাবনা মাত্র নিয়ে যে জীবন—ক্ষণিকের হ'লেও, যে আনন্দ প্রদান করে, অমৃতের মধ্যে তা'র সন্ধান মিলে না। সম্ভাবনার যে উন্মাদ আনন্দ, তা অমৃতের মধ্যে নেই, আফিমের মধ্যে আছে। সেখানে সবই হ'য়ে গেছি, কিছু

হ'তে বাকী নেই ; সবটাই সম্পূর্ণ, সেখানে গল্পটা শেষ হ'য়ে গেছে। আমার জীবন সম্ভাবনা নিয়ে, আমার জীবন-নাটকের যবনিকা পড়ে নি, পড়বে না ; আমি যাব, আর-এক কমলাকান্ত আসবে। সেখানে কমলাকান্ত এক এবং অদ্বিতীয়, এবং তা'র আর পরিবর্ত্তন নেই। সে একটা জ্যান্ত mummy হ'য়ে পড়ে থাকা মাত্র।

এখন পৌরাণিক যুগ গিয়ে বিজ্ঞানের যুগ এসেছে ; স্বর্গের কল্পনাটাও একটু বদ্‌লে গিয়ে নতুন মূর্ত্তি ধরেছে। নক্ষত্র-লোকের পরপারে স্বর্গকে আর বিজ্ঞানের telescopeএ দেখা যাচ্ছে না ; তাই মানুষ আপনার গৃহস্থালীর ভেতর, আপনার রচিত সমাজ-দেহের ভেতর, রাষ্ট্র-বিস্তারের মধ্যে, স্বর্গের ভিত গাড়তে সুরু করেচে। Valhalla, বা Empyrianএর কল্পনা ছেড়ে দিয়ে, মানুষ Utopiaর নূতন বনেদ্ খুঁড়তে আরম্ভ করেচে।

Some day here and everywhere Life, of which you and I are but anticipatory atoms and eddies, Life will awaken indeed, one and whole and marvellous like a child awakening to conscious life.

এই সেই পুরাতন কল্পনা নূতন আকারে হাজির করা হয়েছে মাত্র ; এ কল্পনার মূলে সেই আকাঙ্ক্ষা—সম্পূর্ণ হ'লেই আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি ও যবনিকা পতন। Serenity, beauty, all the works of men—in perfect harmony—minds brought to harmony—an energetic peace—confusions dispersed—A world of spirits—crystal clear.

শুধু অমৃত ও চতুর্হস্ত আর রক্তাম্বর বাদ, আর সবই সেই পুরাতন কথা। বৈজ্ঞানিক Utopiaয় কি থাকবে আর কি থাকবে না, তা'র বিশেষ বিবরণ এই—

Here was no yelping and howling of tired and irritated dogs, no braying, bellowing, squealing, and distressful outcries of uneasy beasts, no farm-yard clamour, no shouts of anger, no barking and coughing, no sounds of hammering, beating, sawing, grinding, Mechanical hooting, whistling, screaming, and the like, no clattering of distant trains, clanking of automobiles, or other ill-contrived mechanisms, the tiresome and ugly noises of many an unpleasant creature were heard no more. In Utopia the ear, like the eye, was at peace. The air which had once been a mud of felted noises was now a purified silence.

কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে মানুষ মোটের মাথায় যা ছিল, এখনও তাই রয়েছে, অতএব ৩০০০ হাজার বৎসর পরেও তাই থাকবে না কেন? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা তাই থাকবে, সেই মৃত্যু, সেই ব্যাধি, সেই ভূমিকম্প, সেই ঝঞ্ঝাবাত, সেই বিষধর সর্প, সেই অগ্ন্যুৎপাৎ, জলে স্থলে সেই হিংস্র পশু পক্ষী—শুধু মাঝখান থেকে মানুষ দেবভাবাপন্ন হ'য়ে যাবে, আমি একথা বিশ্বাস

করি না। যে উপায়ে ভূতল রসাতলে না গিয়ে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হ'তে পারে তা' আমি জানি। তবে মানুষ যদি চিরদিন নাবালক থেকেই সুখী হয়, দিদিমার গল্পেই যদি তা'র শান্তিলাভ ঘটে, আমি তা'কে নূতন পন্থা বাৎলে দিয়ে বিব্রত করতে প্রস্তুত নই; আর পথ বাৎলাতে গেলে নিজের বিপদও কম নয়!

১৭

বাস্তু

বাস্তু প্রধানতঃ তিন প্রকার—বাস্তু-দেবতা, বাস্তু-ঘুঘু আর বাস্তু-সাপ।

বাস্তু-দেবতা সম্বন্ধে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এইরূপ কহিয়াছেন, যথা—"পূর্ব্বকালে অন্ধকগণকে বধ করিবার সময় শূলী শম্ভুর ললাটের স্বেদবিন্দু ধরা পৃষ্ঠে পতিত হইলে পর, তাহা হইতে এক করালবদন প্রমথের উদ্ভব হয়। সেই ভূতযোনি জন্মিবামাত্র সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। সমর ক্ষেত্রে নিপতিত অন্ধকগণের রুধির স্রোতে পিপাসা নিবৃত্তি না হওয়ায়, সেই প্রমথ প্রমথনাথের ধ্যানে নিমগ্ন হয়; আশুতোষ তাহার নিদারুণ তপশ্চরণে পরিতুষ্ট হইয়া বলেন 'বরং বৃণু'। প্রমথ বলিল 'ভূমণ্ডল হইতে ত্রিদিব পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাস করিতে পারি এই বর প্রদান করুন'; আশুতোষ বলিলেন 'তথাস্তু'। তখন সেই প্রমথ নিজ দেহ বিস্তার করিয়া স্বর্গমর্ত্ত্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেবাসুর সকলেই ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ পিশাচকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া নিশ্চল করিয়া ফেলিলেন। তখন পিশাচ বলিল 'হে দেবগণ, আপনারা ত আমার চলৎ-শক্তি হরণ করিলেন, আমি কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিব?' তখন ব্রহ্মাদি দেবতারা বলিলেন, 'তুমি আজ হইতে

বাস্তু-দেবতা হইলে, তোমার প্রীত্যর্থে যে বাস্তু-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইবে তাহারই বলি অর্থাৎ উপকরণ তোমার ভোজ্য হইল।' বিচক্ষণ দেবতাসকল এই প্রকারে আপনাদের বিপত্তি মানুষের উপর চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।*

পুরাণকার মাত্রেই রূপক ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ; সোজা কথা সাদা রকমে বলা তাঁদের ধারা নয়। কিন্তু এ রূপকের গূঢ় তাৎপর্য্য কাহারও বুঝতে বাকি থাকবে না। আমাদের সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির উপদেবতা স্বরূপ যে ভূস্বামীকূল নিরীহ রায়তের স্কন্ধে ভর করে' পুরুষানুক্রমে খোস মেজাজে দিনপাত করে' আসচেন, তাঁদেরই লক্ষ্য করে' যে এই রূপক রচনা করা হয়েচে, তা'র আর ভুল কি ? আশুতোষরূপী রাজস্ব-বিশারদ পণ্ডিতগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রাজস্বের পাকা বন্দোবস্ত করে', সেই ভূস্বামীদিগকে Rent Collectorএর পদ থেকে উন্নীত করে', বাস্তু-দেবতা বানিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচেন, সেই বাস্তুগণ সমস্ত দেশটাকেই আচ্ছন্ন করে' রেখেচেন। আর 'বাস্তু মধ্যে তু যো বলিঃ' তাঁদেরই প্রাপ্য হ'য়ে রয়েচে। সে বলির অন্ত নেই ;—চাষা ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেবে, তা'র জন্য বাস্তু-দেবতাকে যজ্ঞভাগ দিতে হবে, রৌদ্রে শিশিরে চাষা ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন করবে, তা'র অগ্রভাগ তাঁকে দিতে হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর বাস্তু-কপোত বা ঘুঘুর কথা বলি শ্রবণ কর। এই বাস্তু-ঘুঘু নানা জাতীয়—পক্ষীতত্ত্ব-বিশারদ লাহা মহাশয় জানেন, যথা—তিলে-ঘুঘু, পাঁড়-ঘুঘু, রাম-ঘুঘু ইত্যাদি, তফাৎ মাত্র রঙে,

না হ'লে সবই ঘুঘু। এই কপোতকুল যে ভিটায় চরতে আরম্ভ করে, তা'র আর নিস্তার নাই। এই কপোতকুলের কবলে পতিত হ'য়ে আজ পর্য্যন্ত কেহ যে মুক্তিলাভ করেছে তা'র প্রমাণ পাওয়া যায় না। এরা এক আড়ি দিয়ে তিন আড়ি গ্রহণ করে। এরা মহা-জন, গরীবের প্রতি অনুগ্রহ করতে পশ্চাৎপদ নয়; তবে সকল ঐহিক অনুগ্রহ যেমন মূল্য দিয়ে শোধন করে' নিতে হয়, ইহাদেরও অনুগ্রহ শতকরা ২৫ বা ৫০ হিসাবে, ত্রৈমাসিক বিশ্রাম সহ (quarterly rest) ব্যাজ দিয়ে কিনতে হয়। আর একবার সেই মহাজনগণের আটাকাটিতে পড়লে, মরলেও নিস্তার লাভ করা যায় না। বাস্তু-দেবতার বলি যোগাতে যোগাতে নিঃস্ব চাষী এই কপোতকুলের কবলে না পড়ে'ও পারে না। দুঃখ এই, যে এ পর্য্যন্ত এমন পাখ-মারা কেহ জন্মাল না, যে এ ঘুঘুর বাসা ভেঙ্গে দিয়ে চাষীকে মুক্ত করে। দেশের প্রাণ সে বেচারা, ধুঁয়ার ছলনা করে' নয়, সত্য সত্যই চোখে ধোঁয়া দেখে' আর কেঁদে' দিন কাটায়।

তারপর বাস্তু-সাপের কথা। এ সাপ অজর অমর, এমন কি সনাতন বল্লেও চলে। বিষধর হলেও ঘরের কোণে বহুকাল বাস করার জন্য গা-সওয়া হ'য়ে গেছে; ক্রমে ল্যাজ খসে' যাচ্ছে বটে, কিন্তু বিষের কিছু কমতি হয় নি। এ সাপকে ignore করে' চলে' গেলে, তোমার গা ঘেঁসে গেলেও, একবার ফোঁসটি পর্য্যন্ত করবে না, কিন্তু অসাবধানে ল্যাজে পা দিয়েছ কি অমনি ফণা বিস্তার করে' দংশনোদ্যত হবে। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ! এ বাস্তু গৃহ-দেবতারূপে ঘরে ঘরে বর্ত্তমান, দেশব্যাপী পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের আশ্রয়ে

ইহার বসতি, অন্ধকারই ইহার শক্তি, বাস্তু মারলে গৃহস্থলীর অকল্যাণ এই অন্ধ বিশ্বাস ইহার জীবনধারণোপায়। ফোঁসের ভয়ে কেউ কিছু মুখ ফুটে বল্‌তে পাচ্চে না, কিছু করা ত দূরের কথা, কিন্তু তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে এই প্রার্থনা উত্থিত হ'তে আরম্ভ হয়েচে :—

অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালীয়হ্রদং,
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং।
যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং,
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥

১৮

মাঝামাঝি

মুখুয্যে মহাশয় একজন "স্ব-ভাব" মৌতাতী, বড় উমদা লোক। "স্ব-ভাব" মৌতাতী কা'কে বলে বোধ হয় তোমরা জান না। লিভারে ব্যথা, বা অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য, বা রক্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে এলে পর যারা উপদ্রবী liquid fire পরিত্যাগ করে' নিরুপদ্রব অহিফেন ব্রত গ্রহণ করে' তা'রা "ভঙ্গ"। অন্ধকার হ'তে আলোয় আসলে, অর্থাৎ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলে, আধ্যাত্মিক বা আত্মিক কারণ ছাড়া আরও আরও কারণ থাকতে পারে বলে', অনেক সময় সে আলোয় আসাকে সৎসাহসের পরিচায়ক বলে' না ধরে' নিয়ে, লোকে অধঃপতনের কারণই বলে' থাকে। মৌতাত সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞের সেইরূপ ধারণা; অহিফেনের সঙ্গে যার অহেতুকী প্রেম, "কারে পড়ে" প্রেম নহে, তা'কেই বলে "স্ব-ভাব" মৌতাতী, আর সব "ভঙ্গ"।

সেই মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ি একবার কুটুম্বিতা করতে গিয়েছিলুম। সায়াহ্নে তাঁর বৈঠকখানায় বহুলোকের সমাগম হয়; বলা বাহুল্য সকলেই মৌতাতী—স্ব-ভাব ও ভঙ্গ উভয়বিধ। মুখুয্যে মশায় সকলকে "আফিং সেবন হয়েচে ত ?"—বলে' স্বাগত জিজ্ঞাসা কল্লেন। সকলেই সস্মিত মস্তক সঞ্চালন দ্বারা জ্ঞাপন

কল্লেন যে সে শুভকার্য্য যথাবিধি ও যথাকালে সম্পন্ন হয়েচে। একটি ভদ্রলোক কেবল অতিশয় চিন্তান্বিত হ'য়ে বল্লেন "দেখুন বড় মুস্কিলে পড়েছি।"

মুখুয্যে। মুস্কিল কিসের? মুস্কিলে আসান "কাল"-মাণিকপীর ত আছেনই, তা'র আর ভাবনা কি?

ভদ্রলোক। আজ্ঞে, মুস্কিল কি জানেন? আমি ঠিক ৪টার সময় আফিং খাই; ৪টা ত অনেকক্ষণ বেজেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মৌতাতও হয় নি, বেয়াড়াও ধরে নি; আফিং খেলাম কি না ঠিক বুঝতে পাচ্চি না!

মুখুয্যে। এ ত বাস্তবিকই মুস্কিলের কথা বটে! এখন পুনশ্চ খেলেও মুস্কিল, না-খেলেও মুস্কিল? খাওয়া, আর না-খাওয়া ত জানতাম ন্যায়শাস্ত্রের Excluded middle; কিন্তু এখন দেখচি তা নয়, এতদুভয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থাও আছে—যথা, আফিং খেয়েও যদি মৌতাত না হয়, অথবা আফিং না-খেয়েও যদি খোঁয়ারী না ধরে! উপায়?—অনেক বিচার বিতর্কের পর (যে হেতু where many meet there is wisdom, আর সে many যদি মৌতাতী হয় তা হ'লে ত কথাই নেই) স্থির হ'য়ে গেল যে এক মাত্রা সেবন করাই বিধি—যদি দোকরই হয়—অধিকন্তু ন দোষায়।

কিন্তু আমি সেই মুহূর্ত্তে এই "মাঝামাঝি"র সমস্যা ভাবতে লাগলুম,—দেখলুম যে, যেখানে "মাঝামাঝি" সেইখানেই মুস্কিল। Golden mean বলে' একটা অবস্থা আছে, সেটা half-way houseএর মত, মধ্য পথে ক্ষণিক বিশ্রামের স্থান হ'তে পারে, কিন্তু

গন্তব্যস্থান, পথের শেষ, goal হ'তে পারে না। কাছে ও দূরে, অন্তরে বাহিরে, আমি কোথাও মাঝামাঝি ব্যবস্থা চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলে' দেখতে পেলুম না। প্রসন্ন খাঁটি দুধের সঙ্গে পবিত্র গঙ্গোদক মিশ্রিত করে' যে মাঝামাঝি পদার্থ সৃষ্টি করে, তা'তে দুগ্ধ এবং গঙ্গোদক উভয়েরই মাহাত্ম্য নষ্ট হ'য়ে যায়; golden mean বলে' প্রসন্নকে কেউ মার্জ্জনা করে না, মুখে কা'রও বলতে সাহস হ'ক আর নাই হ'ক। সাদায়-কালায় মিশিয়ে যে চুনোগলি, এন্টালি প্রভৃতির সৃষ্টি, সে-সকল মাঝামাঝি জীবের গুণাগুণ যা'রা জানে তা'রা বলে—give me a true-born Englishman or an unadulterated native but not one who is neither fish nor flesh nor a good red-herring, অশ্বতর golden mean হ'লেও প্রকৃতির ত্যজ্যপুত্র।

জল ও স্থলের মাঝামাঝি যে জিনিষ তা'র নাম কর্দ্দম; জলে সাঁতার কাটা চলে, স্থলে দৌড়ান যায়; কিন্তু হাতিও 'দঁকে পড়লে' কাবু হ'য়ে যায়—এমন কি ব্যাংএও লাথি মেরে যেতে পারে।

সত্যি ও মিথ্যা ছেলেবেলা মনে করতুম চিন্তারাজ্যকে dichotomy করে' ভাগ করেচে। কিন্তু "ক্রমশো বিজ্ঞতমঃ" হ'য়ে বুঝলুম যে, সত্য ও মিথ্যার মাঝামাঝি একটা খুব প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে, সেখানে সত্যের শুভ্রতা বিনয়ের কলপ দিয়ে মলিন করা হয়েচে, এবং মিথ্যার মালিন্যকে সততার চূণকাম করে' বেশ ধবলতা দেওয়া হয়েচে; এই সত্য-মিথ্যার মাঝামাঝি ক্ষেত্রে যে খেলোয়াড় জয়যুক্ত হ'তে পারে সে কুরুক্ষেত্র বা ওয়াটারলু জয়ী অপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝামাঝি যে ত্রিশঙ্কু রাজার পারলৌকিক অবস্থানমার্গ—যে রাজ্যটা হওয়া আর না-হওয়ার মধ্যবর্ত্তী, যে রাজ্যের নাম বাঙ্গালায় বলে "হইলে-হইতে-পারিত", আর ইংরাজিতে বলে fool's paradise, যে রাজ্যের যাত্রী আমরা অনেকেই, তা'র খুব বেশী পরিচয় দেবার প্রয়োজন হবে না।

শত্রু ও মিত্রের মাঝামাঝি এক জীব থাকেন তাঁর নাম নিরপেক্ষ neutral,—যিনি কারও অপেক্ষা করেন না, যিনি ঐহিক সম্পদে এতই উচ্চে অবস্থিত যে কারও অপেক্ষায় না থাকলেও চলে, তাই তিনিই নিরপেক্ষ। অথবা যিনি neutre অর্থাৎ ক্লীব, তিনিই neutral, জোর করে' 'হাঁ' কিম্বা 'না' যাঁর বলবার সাহস জুয়ায় না তিনিই neutral.

এই neutrality ব্যক্তি বা সম্প্রদায় মধ্যে নানা রূপ ধারণ করতে পারে যথা, benevolent neutrality, বা armed neutrality; কিন্তু যে প্রকারের neutrality-ই হ'ক, যিনি নিরপেক্ষ বা ক্লীব (neutre) তিনি উভয় পক্ষেরই শত্রু; সুতরাং বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন লোকে বুঝেই রাখে—He who is not for us, is against us. ইহাই নিরপেক্ষতারূপ মাঝামাঝি অবস্থা বিষয়ে নিরাপদ পন্থা।

রেলে তৃতীয় শ্রেণী আছে, দ্বিতীয় শ্রেণী আছে, আর মাঝামাঝি শ্রেণী অর্থাৎ intermediate class আছে। এই মাঝামাঝি শ্রেণীর যে কি নিগ্রহ তা যে রেলপথে যাতায়াত করেছে সেই জানে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে মাঝামাঝি শ্রেণীকে

তাড়াতাড়ির সময় চেনা যায় না ; ষ্টেসনে গাড়ি থামলেই আত্মরক্ষার জন্য মাঝামাঝি শ্রেণীর লোকদের "দেড়া দেড়া" বলে' চীৎকার করতে হয়। তা'তে দুটা অনর্থ ঘটে—একতো, তৃতীয় শ্রেণীর লোক-তাড়ানর জন্ম তাদের বিরাগ ভাজন হ'তে হয় ; তারপর, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের হ'তে তাঁরা যে উঁচু, এই অভিমানটা প্রত্যেক-বারই প্রকট হ'তে হ'তে, অন্তর্নিহিত উত্তাপটা বেড়ে গিয়ে তাঁদের নৈতিক অবনতি সাধন করে। মাঝামাঝি শ্রেণীকে চিরদিনই—রেলের গাড়িতেই হ'ক বা জীবনের পথেই হ'ক, এই রকম আপনাদের বিশেষত্বটা জাহির করবার জন্য সদাই সজাগ থাকতে হয়, পাছে গোলা লোকের সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তাঁদিকে কেউ চিনতে না পারে এইজন্য সদাই self-conscious হ'য়ে, ত্রস্ত হ'য়ে, শিউরে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকতে হয় ; তা'তে সকলদিকেই অস্বস্তির কারণ হ'য়ে উঠে।

Genius যে তা'র সাতখুন মাপ ; সে Convention মানে না, সে গতানুগতিক নয়। সে বেপরোয়া, আপনার পথ আপনি কেটে চলে ; আর যে Genius নয়, গোলালোক, সে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসান দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে যায়। কিন্তু যে intermediate classএর লোক, অর্থাৎ গোলালোকও নয় এবং Geniusও নয়, সে সদাই অসুখী, আর তা'র ঝাঁজও অসহ্য। কবি বলেচেন—Unpretending mediocrity is good, and genius is glorious ; but a weak flavour of genius in an essentially common person is detestable. It

spoils the grand neutrality of a commonplace character, as the rinsings of an unwashed wine-glass spoil a draught of fair water.

ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি যে স্তর, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত লোক, তাদের মত হতভাগ্য কি কেউ আছে? ধনী যে সে potential energyতে ভরপুর; দরিদ্র যে সে তা'র হাত পা নিয়ে kinetic energy নিয়ে বলবান, সে দিন আনে দিন খায় বটে কিন্তু কারও মুখাপেক্ষা করে না, দরকার হ'লে গতর খাটায়, আবার দরকার হ'লে চুরি ডাকাতিও করে বা ভিক্ষা করে; কিন্তু মাঝামাঝি অর্থাৎ মধ্যবিত্ত লোক Cannot beg, nor can they steal; অনেক সময় গতর খাটাতেও নারাজ, সুধু মস্তিষ্ক চা'লনায় যা হয়। দুর্দ্দিনে ইহারাই বেশী কষ্ট পায়, ধনীও নয়, দরিদ্রও নয়।

জানা আর না-জানার মাঝামাঝি, জ্ঞান ও অজ্ঞানতার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাও কি ভয়ানক! কবি বলেছেন—Where ignorance is bliss 'Tis folly to be wise—ইহার অর্থ এ নয় যে, অজ্ঞানতা ভাল জ্ঞানের অপেক্ষা; ইহার অর্থ—যখন অজ্ঞানতাই সুখের তখন জ্ঞানী হওয়া মূর্খতা। অজ্ঞানতা সুখের কখন? যখন জানা না-জানার মধ্যস্থলে থেকে মানুষ হাবুডুবু খায়, তখনই বরং অজ্ঞান তিমিরই ভাল। কেন না অন্যত্র কবি বলেছেন—Drink deep or taste not the Pyerian spring; আমাদের চলিত কথায়ও বহুকালের অভিজ্ঞতা এই ভাবেই ব্যক্ত করা আছে—

যে বুঝেচে সে মজেচে
যে বুঝেনি সে আছে ভাল
যে আধ্ বুঝেচে তার প্রাণ গেল।

একচ্ছত্রী নিরঙ্কুশ সম্রাট যাঁর ইচ্ছাই আইন,—আর সকল শাসন ক্ষমতার প্রস্রবণরূপী জনশক্তি, তা'র আদেশ ও ইচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে শাসনযন্ত্র—এই দুই ধারার, Autocracy ও Democracyর, মধ্যবর্ত্তী একটা খিচুড়ী আছে যার নাম Limited monarchy. এ মাঝামাঝি ব্যবস্থার যে বাহার তা'র খরচ অনেক; সে খরচ বাজে খরচ বলে' দুই একটা দেশ ছাড়া, আর সব বড় দেশ থেকে সে শ্বেত-হস্তীর পূজা উঠে গেছে।

স্বাধীন ও পরাধীনের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা হচ্ছে Protectorate; মহাযুদ্ধের পর Protectorate কথাটার কাকু ধরা পড়ে যাওয়াতে, আর একটা কথা তা'র পরিবর্ত্তে ব্যবহার আরম্ভ করা হ'য়েচে—Mandatory; বস্তু একই, অর্থাৎ দেশটা দেশবাসীরই রইল—কেবল চাবিকাটিটা Mandatory, অর্থাৎ যিনি বা যাঁরা ভার-প্রাপ্ত, তাঁদের আয়ত্বের ভিতর থাকল। এই রকম Protectorate বা Mandatory ইংলণ্ডেরও আছে, ফরাসিরও আছে, ইটালিরও আছে। ফরাসির Mandatory আনাম প্রদেশ, সেখানে রাজা আছেন, তাঁর দরবার আছে—তিনি আইনে সর্ব্বশেষ স্বাক্ষর না করলে আইন মঞ্জুর নয়—কিন্তু মঞ্জুর না করাও তাঁর ইচ্ছা সাপেক্ষ নয়; এই যে Duality বা দ্বৈতবাদ, কাগজে কলমে ইহার একটা অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু আনামবাসীদের জীবনে ইহার

কোনই সার্থকতা নাই, যদি কিছু থাকে তা অর্থনষ্ট ও মনোকষ্ট দুই একসঙ্গে ; কেননা মোটা মোটা মাহিনার বড় ছোট মেজো ফরাসি কর্ম্মচারী দেশের অর্থ শোষণ কচ্চেন, আর দেশের লোক যে তিমিরে সেই তিমিরে রয়ে গেছে। মাঝামাঝি থাকার পূর্ণ প্রতিফল তা'রা পাচ্চে। এইরকম সকল Protectorateএরই দুরবস্থা।

আমাদের দেশে Bureaucracy অর্থাৎ Autocracyর কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করে', Democracyর দিকে শাসন-যন্ত্রটাকে নিয়ে যাবার জন্য, মধ্যপথে, auto-democracy (জানি না একথাটা চল্‌তি কি না) বা Diarchy নামধেয় একটা নবীন পদ্ধতির experiment চলেচে। বেওয়ারিশ রোগীর উপরই হাসপাতালে experiment চলে। আমরা বেওয়ারীশও বটে, রোগগ্রস্তও বটে ; তাই আমাদের উপর এই উদ্ভট শাসন-পদ্ধতির experiment চলেচে—দেখা যাক রোগ গিয়ে স্বাস্থ্য ফিরে আসে, কিম্বা রোগ ও রোগী দুইই যায় !

কেহ কেহ বলেন যে এটা transitional period. আরে বাবা, গচ্ছতি ইতি জগৎ, এর স্থিতি বলে' কিছু নেই, এটা সকল মুহূর্ত্তেই চলবে, এর সকল মুহূর্ত্তই transitional. সৃষ্টির মুহূর্ত্ত থেকে লয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্তটাই একটা বড় বিরাট transition ; এর স্থিতি বলে' যদি কিছু থাকে সেই শেষে যখন finish বলে' গ্রন্থ শেষ হ'য়ে যাবে। আর মানুষের জীবনে এই যে সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, অর্থাৎ যাকে স্থিতি বলা হ'য়েচে, সেটা মাঝামাঝি অবস্থা ; আর মাঝামাঝির সকল দুঃখ তা'র ভিতর আছে। কবি

বলচেন—From the great deep to the great deep he goes, এই দুই অতলস্পর্শের মধ্যস্থিত—অনাদি অতীত ও অনন্ত অনাগতের মাঝামাঝি দুদিনের ঘুর্ণিপাকে কি আলোড়ন বিলোড়ন, এই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ যোজকের মধ্যে কি নাবাউঠা, কি টানাটানি,—"মাঝামাঝি"র সমস্ত দুঃখের কি একত্র সমাবেশ! এ দুঃখের একমাত্র ঔষধ আমি জানি, যদি কেউ চাও ত আমি দিতে পারি।

১৯

বলা ও করা

আজন্ম শুনে আসচি যে "বলা সহজ, করা শক্ত"। প্রবচন মাত্রেই যেমন আধা-সত্য এটাও তাই। কিন্তু সত্যের চেয়ে আধা-সত্য মারাত্মক হ'লেও যেমন চলতি বেশী, এ আধা-সত্যটারও চলন লোকের মুখে মুখে। সত্যের একটা পরীক্ষা (সেটা চূড়ান্ত পরীক্ষা না হ'লেও) লোকের মুখেই হ'য়ে থাকে—দাদা কি বলেন, গুরুজী কি বলেন, অমুক মহামহোপাধ্যায় কি বলেন, অমুক ন্যায়পঞ্চানন কি বলেন, শেষ মনু কি বলেন, যাজ্ঞবল্ক্য কি বলেন—যে হেতু জ্যান্তর চেয়ে মরার কথার বেশী জোর—আর মুখের যুক্তি অপেক্ষা লিখিত তথা ছাপিত যুক্তির জোর নিশ্চয়ই বেশী। ফরাসীতে বলে—parole s'en vole, ecrit reste—কথা হওয়ায় উড়ে যায়, লেখা থাকে। লেখা তথা ছাপার যেমন একটা গুণ স্থায়িত্ব, তেমনি একটা দোষ উড়ে না যাওয়া। যে কথাটা শূন্যগর্ভ বলে' একদিনে হাওয়ায় উড়ে যেত, সেটা ছাপা হ'লে অন্ততঃ এক বছর বেঁচে থাকবে; আর যদি কোন স্থানে চাপা পড়ে থেকে, উই আর ইঁদুরের হাত থেকে কোন রকমে বেঁচে গিয়ে, দু'শ বৎসর পরে তা'র resurrec-

tion হয়—তা হ'লে সেটা আরও দু'শ বছর বেঁচে থাকবার মত পরমায়ু লাভ করবে। ছাপাখানার যদি কিছু দোষ থাকে ত এই অপদার্থকে পদার্থত্ব দিয়ে মূল্যবান করে' তোলা—অন্য কোনদিক দিয়েও যদি না হয় ত অন্ততঃ ঐতিহাসিক তথ্য বলে' তা'র কদর হবে।

কিন্তু আমি বলছিলুম—লোকে যে বলে "বলা সহজ করা শক্ত" —সেটা আধা-সত্য। বলাও যে এক রকমের করা, তা'র কথা পরে বলছি। আমি দেখছি করা সহজ, বলাই শক্ত। সম্ভাব্যের অতীত যা তা করতে কেউ পারবে না, কিন্তু যেটা বলা কিছুই অসম্ভব নয় সেটাও সকলে বলতে পারে না। চুরি করার চেয়ে, চোরকে চোর বলা শক্ত; আইন বলেচেন—the greater the truth, the greater the libel; অতএব সত্যকথা বলিচি বলে' পার পাবার জো নেই; বরং মিথ্যা বলে'—চোরকে সাধু বলে', বেঁড়েকে চামুরে বলে', পার ত পাওয়াই যায়, উপরন্তু কিছু লাভও হ'য়ে যেতে পারে। দুনিয়ায় দুষ্কার্য্য বলে' যে শ্রেণীর কাজ লোকে করে তা'র তালিকা অফুরন্ত, দুষ্কার্য্য হ'লেও লোকে করচে—কিন্তু সে দুষ্কার্য্যের ব্যাখ্যা বা পরিচয় যে দেবে তা'র উপর দুনিয়াসুদ্ধ লোক খড়্গহস্ত। অতএব আমি যদি বলি করা সহজ বলেই লোকে করে, আর বলা শক্ত বলেই লোকে বল্‌তে পারে না, তা হ'লে কি ভুল হবে?

করার দোষ কথার জালে ঢাকা দেওয়া যায়, কিন্তু বলার দোষ কাজ দিয়ে ঢাকা যায় না। তা হ'লে কোন্‌টা বলবান—করা না বলা? মনে কর প্রসন্ন দুধে জল দিয়েছে, তোমার সাহস থাকে ত

তুমি হয় ত বলে ফেল্‌লে "দুধটা পাতলা হয়েচে"—তা'র উত্তরে প্রসন্ন তোমাকে দু'টা দুর্ব্বাক্য বলে', বা পাওনা টাকার তাগাদা করে' (যেটা দুর্ব্বাক্য অপেক্ষা বেশী বেদনাদায়ক) তোমাকে চুপ করিয়ে দিতে পারে; অথবা যদি সে ভাল মেজাজে থাকে, নতুন গরুর দুধ একটু পাতলাই হবে—ইত্যাকার কৈফিয়ৎ দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ করে' দেবে; মোটের মাথায় দুধে জল দেওয়া কার্য্যটাকে কথার জালে ঢেকে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু যদি সে ধর্ম্ম রক্ষা করে' সত্যি কথাই বলে' ফেলে—তারপর তিন দিন খাঁটি দুধ যোগালেও তা'র দুধে জল দেওয়ার অপবাদ ঢাকা পড়বে না। ছোট বড় সব কথায় ও সব কাযেই এই রকম। যুদ্ধে হেরে ভাল করে' despatch বা communique লিখতে পারলে গাধা-হারও ঢাকা দেওয়া যেতে পারে; অনেক যুদ্ধ এই রকম বাক্য দ্বারাই জয় করা হয়েচে। জাল করা ত সব যুগে সব দেশে সব স্থলে অন্যায়, কিন্তু জাল করে' ক্লাইভ যে কৈফিয়ৎ দিয়েচেন তা'তে ক্লাইভকে জালিয়াৎ বলতে এক জনের মাত্র সাহস হয়েচে; সে কৈফিয়ৎটা এই যে, উমিচাঁদের মত দুষ্ট লোককে জব্দ করতে তাঁকে যদি দশবার জাল করতে হয়, তা হ'লেও তিনি পশ্চাৎপদ হবেন না। জাল করার চেয়ে এই বলে' কৈফিয়ৎ দেওয়ার বাহাদুরী বেশী নয় কি?

সেইজন্য বুদ্ধিমান লোকে বেশী কথা কয় না, যা করবার তা করে' যায়। কারণ করায় যদি কিছু গলদ বেরিয়ে যায় ত কথা দিয়ে সে গলদ সংশোধন করে' নেবার উপায় থাকে; কিন্তু কথা, হাতের ঢিল, ছেড়ে দিলে আর তা'কে ফেরাবার উপায় থাকে

না, কথা দিয়েও নয়, কাজ করেও নয়। নীরব সাধনার অনেক সময় গূঢ় তত্ত্বই এই।

কথায় বলে the less said the sooner mended, তা'র মানে, কথার ছাপ মুছে না, সে ছাপ যত গভীর হ'য়ে বসে, তা'কে মুছে ফেলা তত শক্ত; অতএব, যা কর তা কর, কথা কয়ে কার্য্যের প্রকৃতি বা উদ্দেশ্যটাকে প্রকট করে' দিও না, যদি কোন সময়ে বিপরীত মত জাহির করতে হয়—তা ঘটে উঠবে না। কাজের প্রকৃতি মল্লিনাথের টীকায় বদলে যেতে পারে, কিন্তু কথার অর্থ খুব বেশী বদলান যায় না। এ দুনিয়ায় অনেক সময় কতবার পা পিছলে পড়ে যেতে হয়, কিন্তু কোন কথা না বলে' ঝেড়ে উঠে পড়তে পারলে, পড়ে যাওয়াটার নানা interpretation দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু হুঁচট্ খেয়েছি বল্লে আর 'শয়নে পদ্মলাভ' বলা চল্‌বে না। অতএব Thou shalt not speak out এইটা দুনিয়াদারীর একাদশ Commandment হওয়া উচিত।

সে দিন বাঙ্গালার একজন বিরাটপুরুষ একখানা অগ্নিগর্ভ পত্র লিখে তাঁর উপরওয়ালাকে জানিয়ে দিলেন যে, সব হুকুম বা সকল আবদার, সব মানুষের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। পত্রখানার ভাষা নিয়ে ও ভঙ্গী নিয়ে কতই না আলোচনা গবেষণা হ'য়ে গেছে। যাঁরা পত্রখানার ধরণটা পছন্দ করেন নি, তাঁরা যদি তাঁদের মনোমত একখানা খসড়া করে' ছাপিয়ে দিতেন তা হ'লে ঠিক বুঝা যেত, তাঁদের কিরূপ রুচি ও শক্তি, তাঁদের টিপ্পনী থেকে ঠিক বোঝা গেল না যে, কি হ'লে তাঁরা সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু ধরণটা যা'ই হ'ক, পত্র

লেখকের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে, প্রতিপক্ষ যে বাক্যস্ফূর্ত্তি করতে অপারগ হয়েছেন—তা'তেই তাঁর আঘাতের বেগ ও লক্ষ্য যে সম্পূর্ণরূপ সময়, ব্যক্তি ও বিষয়োপযোগী হয়েছে তা'র আর ভুল নেই। ঘুষিটা চোখে না মেরে, পিঠে মারা উচিত ছিল, অথবা ঘুষি না মেরে চড় মারা উচিত ছিল, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। অথবা কড়া কথা না বলে' দু'টা মিছরীর ছুরী হানলে মন্দ হ'ত না, এ তর্কও কোন কাজের নয়। যে হেতু দেখা যায়, যেখানে কাজের প্রতি আস্থা কম, সেইখানেই কায়দার প্রতি দৃষ্টি বেশী; আর সত্যিকারের প্রাণ যেখানে নেই, সেইখানেই আচারের আড়ম্বরই সর্বস্ব।

কিন্তু দুনিয়ায় যা কিছু বড়, যা কিছু কাজের, তা কথা থেকে সুরু হয়েছিল; সে কথা বজ্রের মত দিগন্ত ধ্বনিত করে', কাপুরুষকে কম্পিত করে', অপরাধীকে ভৎসিত করে', অজ্ঞানকে নাড়া দিয়ে, ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছিল; শব্দব্রহ্ম জেগে উঠে, সুপ্ত জগৎকে জাগিয়ে দিয়েছিল। সে শব্দের পশ্চাতে অগ্নি ছিল, তেজ ছিল, প্রাণ ছিল—সুধু প্রতিধ্বনি মাত্র ছিল না।

শূন্যগর্ভ প্রান্তরের পরপার হ'তে প্রতিধ্বনি আসে; শূন্যগর্ভ মানস-ক্ষেত্র হ'তে প্রতিধ্বনি শুনা যায়। আমাদের জীবনটাই প্রতিধ্বনিময় হ'য়ে দাঁড়িয়েচে; কোথায় কবে কোন্ ধ্যানলব্ধ মন্ত্রের উদাত্তস্বর ধ্বনিত হয়েছিল—আমাদের শূন্য মানসক্ষেত্র হ'তে তা'র প্রাণহীন পুনরাবৃত্তি শোনা যাচ্ছে। যে যেদিক থেকে হাঁক দিচ্ছে, অমনি আমাদের শূন্য জীবন-প্রান্তরের এক প্রান্ত হ'তে, তা'র

প্রতিধ্বনি উত্থিত হচ্চে ; কিন্তু প্রতিধ্বনি, প্রাণহীন অসম্পূর্ণ মুহূর্ত্ত-মাত্র স্থায়ী ; আমাদের হৃদয়ের সাড়াও তাই—প্রাণহীন ও মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী। কোন ডাকই আমাদের অন্তরাত্মাকে জাগাতে পাচ্ছে না, প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনিতেই সব মিলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মুখের কথা সেই প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি ; এই অর্থে আমাদের পক্ষে কথা কহা সহজ, কাজ করা শক্ত। কিন্তু যে বাক্য অত্যাচারের মস্তকে বজ্ররূপে পতিত হয়, অসত্যের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে, অন্যায়ের অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে' তা'র দানব-মূর্ত্তি প্রকাশিত করে' দেয়, সে বাক্য জ্ঞানের পরিপূর্ণতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও অকুতোভয়ে স্ফুরিত হয়। সে বাক্য অমূল্য !

২০

মা ভৈঃ

চারিদিকে সাড়া পড়ে' গেছে, "নারী জেগেচে", ভারত উদ্ধারের আর বেশী দেরী নেই; আমি কিন্তু দেখছি, "নারী রেগেচে", তা'র সঙ্গে ভারত উদ্ধারের কোন সম্বন্ধই নেই। কেউ কেউ বলবেন—রেগেই' যদি থাকেন—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানুষ ত রাগতে পারে না, অতএব আদৌ জেগেছেন, পশ্চাৎ রেগেছেন, এমন ত হ'তে পারে? হাঁ তা পারে; কিন্তু অনুগ্রহ করে' যদি নিদ্রাই ভঙ্গ হ'য়ে থাকে, ত রেগে কি লাভ?

সতী একবার রেগেছিলেন—আশুতোষের অনুনয় উপেক্ষা করে', দশমহাবিদ্যার বিভীষিকা দেখিয়ে তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে', পিতৃগৃহে অনাহূত হ'য়ে ছুটে গিয়েছিলেন—ফল হয়েছিল পিতার অজমুণ্ড, যজ্ঞপণ্ড, পরে আপনার দেহপাত। তারপর প্রেমময় পাগল স্বামীর স্কন্ধে ঘূর্ণায়মান শবদেহ দিক দিগন্তে ছড়িয়ে চতুঃষষ্টি পীঠস্থানের সৃষ্টি; কিন্তু ধ্বংসলীলার সেইখানেই অবসান হয় নি—প্রত্যাখ্যাত স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের আকাঙ্খায় গিরিরাজ-গৃহে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ, এবং পরিত্যাগের পর পুনর্মিলন হ'য়ে তবে সে নাটকের পরিসমাপ্তি হয়েছিল। তবে তফাৎ এই, সব স্বামী ভাঙ্গড়ভোলা নয়, এমন

কি আফিমখোর কমলাকান্ত পর্য্যন্ত নয়। অতএব এ রাগের ফল কি হবে তাই লোকে ভেবে আকুল হচ্চে।

কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভাবনার বিশেষ কারণ দেখ্‌চি না। প্রথম কারণ, মা সকল তাঁদের নিজের মামলার ওকালতি নিজেই আরম্ভ করে' দিয়েছেন। এই অসমসাহসিকতার কাজ পুরুষও করতে সাহস করত না। মোকদ্দমা চালাতে হ'লে উকীলের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, সেটা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। ধর্ম্মাধিকরণের কাঠগড়ায় ফরিয়াদী হ'য়ে দাঁড়িয়ে, নিজের মামলার নিজে সওয়াল জবাব করা, প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির অন্যতম পরিচয় বলে' আমার আশঙ্কা হয়। ফল যে খুব সম্ভব মোকদ্দমায় হার, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ হয় না। অতএব স্বামী তথা আ-সামীগণকে আমি আশ্বাস দিয়ে, 'মা ভৈঃ' বলতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হচ্চি না।

মা সকল যে সব প্রশ্ন নিয়ে রেগেচেন, বা জেগেচেন, যাই বলুন, তা'র মধ্যে মূল হচ্চে—সাম্য—স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকরণ, equality of the sexes. এই equality বা সাম্য, আপাততঃ এমনই ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত বলে' মনে হচ্চে যে, সে সম্বন্ধে যে কোন তর্ক চলতে পারে তা মনেই আসে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য মাত্র এক হিসাবে আছে—স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই genus homo এই পর্য্যায়ভুক্ত; তা ছাড়া, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সমতা নেই বল্লেই হয়—সামাজিক বা পারিবারিক unit হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষ দু'টী ভিন্ন জীব।

ভিন্ন হ'লেই ছোট বড় হ'তে হবে, তা'র কিছু মানে নেই; বোম্বাই

আম আর মর্ত্তমান কলা, দু'টা ভিন্ন ফল,— কিন্তু কে ছোট কে বড়, ও-প্রশ্নের কোন মানেই হয় না ; ১০৲ টাকায় এক মণ চাল,—১০টা টাকা, আর ১ মণ চাল, দুই তুল্য মূল্য হ'তে পারে, কিন্তু দু'টা এক বস্তু নয়। অতএব দেখা যায়, ভিন্ন হ'লেও তুল্য-মূল্য হ'তে পারে ; কিন্তু তুল্য-মূল্য বলে' এক বা সমধর্ম্মী নাও হ'তে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে সেই কথা—ভিন্নধর্ম্মী বলে' কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় নয় ; তুল্য-মূল্যই যদি হয় তা হ'লেও এক নয়।

People do not realise that equity and equality are not the same thing, that equality may co-exist with difference, and is not secured by sameness, and that just as the heart and the liver may each be considered "equals", tho' performing different functions, so the equality between men and women may, after all, best be secured by not striving for identity.

স্ত্রী ও পুরুষ তথাপি সমান, যদি মা সকল একথা বলেন, তা হ'লে আমাকে বলতেই হবে, মা সকল "রেগেছেন", জেগেছেন একথা বলতে পারব না।

তারপর স্বাধীনতার কথা ; মা সকলের আব্দার এই,—কেন স্ত্রী পুরুষের অধীন হ'য়ে, আজ্ঞাবাহী, পুতুল-নাচের পুতুল হ'য়ে থাকবে। এখানেও আমি "রাগার"ই লক্ষণ দেখতে পাই—"জাগার" লক্ষণ দেখতে পাই না। প্রথম কথা, গৃহস্থলীটা প্রাচীন Sparta রাজ্যের

মত যুগ্ম রাজার রাজ্য হবে, না এক রাজার রাজ্য হবে? দুইএ এক না হ'য়ে গিয়ে, দুইজন (স্ত্রী ও পুরুষ) "স্বতন্ত্র উন্নত" হ'য়ে গৃহস্থলীকে যদি Democratic নীতি অনুসারে শাসন করতে চান, তা হ'লে রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়েই বেশী সুখশান্তি লাভের আশা করা যায়। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায়, যে অধিকাংশ স্থলে একের প্রাধান্যই বলবান হ'য়ে ওঠে—তা সেটা স্ত্রীরই হ'ক, বা পুরুষেরই হ'ক, অথবা স্ত্রী পুরুষ দুইএ মিশে এক হয়েই হ'ক; কিন্তু যেখানে Dual sovereignty সেইখানেই বিরোধ ও পরে বিচ্ছেদ। মা সকলের এটাও দেখা উচিত যে ঘরের বাইরে এই পরাধীন দেশে, পুরুষ বেচারী যে স্বাধীনতা উপভোগ করে, তা'র চেয়ে কিছু কম স্বাধীনতা স্ত্রীগণ অন্তঃপুর মধ্যে উপভোগ করেন না।

তবে মা সকলের পুরুষের উপর বড় বেশী আক্রোশ এইজন্য যে, পুরুষ ব্যাভিচারী হ'লে তা'র সাতখুন মাপ, কিন্তু রমণীর ক্ষণিক দুর্ব্বলতার জন্য একটু পদস্খলন হলেই, সে বেচারী চিরদিনের জন্য দাগী হ'য়ে গেল, তা'র এতটুকু অপরাধেরও মার্জ্জনা নেই। মা সকলের এ কথাটা একটু খোলসা করে' বুঝতে চাই। পুরুষের পক্ষে আইনটাকে খুব কড়া করে' দেওয়া যদি তাঁদের অভিপ্রায় হয়, তা'তে আমার আপত্তি নেই, আমি বরং তা'র খুব পরিপোষণ করি। কিন্তু পুরুষের বেলা আইনটা যেমন আল্‌গা, নারীর বেলাও, সমানাধিকরণের নিয়মে, তেমনি আল্‌গা কেন হবে না—মা সকলের যদি এই অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে নারী রেগেছে বলব না ত কি? আর রাগের সঙ্গেই বুদ্ধিনাশ, আর তারপর—বিনাশ।

সাম্যবাদী বা বাদিনীরা যাই বলুন আর যাই করুন, ব্যাভিচারের যদি পারিবারিক পরিণাম কল্পনা করে' দেখা যায়, তা হ'লে সে পরিণামকে কিছুতেই সমান বলা যায় না। Nothing will equalise the offence, however you equalise the penalty. For nothing can equalise its "consequences" or the degree of wrong that may be done by one to the other.

স্ত্রীগণের স্বাধীনতা লাভের উপায় হিসাবে বলা হয়েছে যে, তাঁরা নিজের নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখুন, অর্থাৎ নিজে নিজে উপায়ক্ষম হ'ন, এবং তদনুযায়ী বিদ্যা বা শিল্প শিক্ষা করুন। কমলাকান্তের গৃহ শূন্য—সে হাত পুড়িয়ে রেঁধেই খেয়ে থাকে, তবুও আমার পুরুষ ভ্রাতাগণের পক্ষ হ'তে এইমাত্র বলবার আছে যে, এই দারুণ আক্রাগণ্ডার দিনেও, পুরুষ একক কষ্ট করে'ও, কোনদিন এ পর্য্যন্ত তা'র গৃহিণীকে বলে' নি—"আর পারি না, তুমি তোমার পেটের অন্ন গতর খাটিয়ে সংস্থান করে' নাও।" পুরুষের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে যদি নারী গতর খাটাতে চায় ত সেটা ভালই বলতে হ'বে; কিন্তু যদি ঐটে অছিলে মাত্র করে' নিজের স্বাতন্ত্র্যলাভের পথ পরিষ্কার করে' নিতে থাকে, তা হ'লে পুরুষ বেচারীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া হবে।

তারপর মা সকল একবার ভেবে নেবেন যে, একবার গতর খাটাতে বেরিয়ে পড়লে, আর স্ত্রী-শিল্প আর পুরুষ-শিল্প বলে' কোন পার্থক্য থাকবে না। ব্যাঙ্কের দাওয়ান থেকে আরম্ভ করে' কোদাল-

পাড়া পর্য্যন্ত, সবই করতে হবে। যে দেশ থেকে স্ত্রী-স্বাধীনতার ঢেউ এ দেশে উপস্থিত এসে লেগেছে, সে দেশে factory girl থেকে আরম্ভ করে' ছুতার, রাজমিস্ত্রি, chauffeur, গাড়োয়ান, মেয়েরা সব কাজই কচ্চে, আবার member of Parliament'ও হয়েচে। স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদে কার্য্যের ভেদাভেদ হয় নি, এবং স্ত্রী "স্বাধীন" বলে' পুরুষের অধীনতা-পাশ থেকে একেবারে মুক্ত হ'তেও পারে নি।

কেন পারে নি তা'র কারণ বলচি। স্বাধীনতা ও সাম্য ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে, সেটার নাম—মৈত্রী। এই মৈত্রীর ক্ষুধা, কি পুরুষ কি স্ত্রী, উভয়েরই হৃদয়ে চিরদিন আছে ও থাকবে; স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবী অপ্রাকৃত, অলীক—কিন্তু মৈত্রীর আহ্বান তাদের প্রকৃতির নিভৃত কন্দর থেকে চিরদিন প্রতিমুহূর্ত্তে ধ্বনিত হচ্চে, সে আহ্বানকে কানে তুলা দিলেও, শুনতে হ'বে, কেননা সেটা বাইরের আহ্বান নয়—সেটা ভিতরের ডাক।

২১

সৈরিন্ধ্রী

আমি একদিন প্রসন্নকে বল্লুম—স্বাধীন হ'বে, প্রসন্ন? প্রসন্ন হাঁ করে' রইল। প্রসন্ন মনে কল্লে হয়ত আমি নেশার ঝোঁকে কথা কচ্চি—তা নয়; আমি আবার বল্লুম—প্রসন্ন, স্বাধীন হবে?

প্রসন্ন। আমি আবার কার' অধীন? আমি কার' খেয়ে রেখেচি যে, পরের এন্তাজারি করতে হবে?

আমি। তবুও স্বাধীন হ'লে—যা খুসি করবে, যেখানে খুসী যাবে।

প্রসন্ন। আমি কোথা যাই না? আমায় আটকে রাখে কে? আমাকে বেঁধে রেখেছে কে? আমি হাটে যাই, মাঠে যাই, তীর্থে যাই, মেলায় মচ্ছবে কোথা যাই না—

আমি। তা বটে, কিন্তু তবু তুমি স্বাধীন হ'লে আর এক রকম হ'য়ে যাবে—স্বাধীন হ'য়ে যাবে।

প্রসন্ন। সে কি রকম?

আমি। বুঝতে পাচ্চ না—স্বাধীন না হ'লে স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝতে পারবে না।

কিন্তু প্রকৃত কথা বলতে কি, প্রসন্নর কথায় আমারই মনে

ধাঁধা লাগতে লাগল, স্বাধীন হ'লে এর বেশী প্রসন্ন আরও কি হ'তে পারত? লড়াইএ যেত—না বক্তৃতা করত?

প্রসন্ন। হাতে পায়ে বেড়ির মধ্যে ত তুমি। বুড়ো ব্রাহ্মণ কোন যোগ্যতা নেই—নিজের ভালমন্দ জ্ঞান নেই—যেন কাঁচ ছেলে—যেন পাগল - তুমিই ত আমার বুড়া বয়সের সব চেয়ে বড় বাঁধন—তা ছাড়া আমার মঙ্গলা আর-একটা বাঁধন, বাঁধনের মধ্যে ত এই দুই।

আমি। গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ—প্রসন্ন ঠিক শাস্ত্রসম্মত হিন্দু-জীবনই ত যাপন কচ্ছ। প্রসন্ন, তোমার আর পুনর্জন্ম হবে না, তুমি তরে' গেলে—তুমি স্বাধীন হও আর না-হও, তা'তে কিছু এসে যাবে না। কিন্তু বয়সকালে তুমি ত ছাড়া-গরুটির মত ছিলে না—তখন ত গোঁজেবাঁধা-গরুর মত সাধু ঘোষের গোয়ালে বাঁধা থাকতে।

প্রসন্ন। যখন যেমন তখন তেমন করতে হবে ত! না হ'লে, সংসার চলবে কেন?

আমি বড় বিস্মিত হলুম; প্রসন্নর দিক দিয়ে স্বাধীনতার আবদার একবারও এল না; আমি "যার বিয়ে তা'র মনে নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই" হিসাবে জাগিয়ে তুলতে গিয়েও কৃতকার্য্য হলুম না। হায় রে বাঙ্গালীর নারী!

প্রসন্ন। রাখ তোমার স্বাধীনতার বাজে কথা; দুটো মহা-ভারতের কথা বল। আমার এ বেলা কোন কাজ নেই।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কোন কাজ না থাকলে সে আমার মুখে শুনতে আসত; পুণ্যবতী বলেই শুনত, কি শুনে

পুণ্যবতী হ'ত, তা ঠিক বলতে পারলুম না। যা হ'ক, স্বাধীনতার কথা ভাবতে ভাবতে সৈরিন্ধ্রীর ইতিহাস মনে পড়ে' গেছল—সেইখান থেকে গল্পটা আরম্ভ করে' দিলুম।

পঞ্চস্বামী বিরাট রাজার সভায় আত্মগোপন করিয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছেন। রূপসম্পন্না অনাথা একবস্ত্রা পাঞ্চালতনয়া দ্রৌপদী আশ্রয় ভিক্ষার্থ সুদেষ্ণার নিকট উপস্থিত হইলে, বিরাট-বধূ তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছেন, পাছে এই লাবণ্যবতী বিরাটরাজার দৃষ্টিপথে পতিতা হন—তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইতে পারে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি কর্ম্ম করিতে অভিলাষ কর?" দ্রৌপদী বলিলেন—"আমি সৈরিন্ধ্রী পরিচারিকা মাত্র, কেশপাশ বিন্যাস, গন্ধ বিলেপনাদি পেষণ ও মল্লিকা উৎপল চম্পকাদি পুষ্পপুঞ্জের বিচিত্র পরম শোভান্বিত মাল্যগ্রন্থনে আমার নৈপুণ্য আছে। পূর্ব্বে আমি কৃষ্ণের প্রেয়সী সত্যভামার আরাধনা করিতাম, পরে দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। আমি উত্তম অশন বসন লাভ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করি, এবং যে স্থানে যতদিন তাহা লাভ করি, সেস্থানে ততদিন আমার মন রত থাকে; সেইজনা আমার নাম মানিনী; আমি আপনার নিকেতনে অবস্থানার্থ সমাগতা হইলাম।"

সুদেষ্ণা কহিলেন—"হে শুচিস্মিতে, শুভ্রু, লোকে যেমন আত্মবিনাশের জন্য বৃক্ষে আরোহণ করে, অথবা কর্কটী যেমন আপন মরণ-কারণ গর্ভধারণ করে, তোমাকে রাজগৃহে আশ্রয় দিলে আমার

পক্ষেও সেইরূপ ঘটিতে পারে।" দ্রৌপদী কহিলেন—"মহাসত্ত্ব পঞ্চ গন্ধর্ব্ব যুবা প্রচ্ছন্ন ভাবে আমাকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন, অতএব কোন ব্যক্তিই আমার প্রতি লুব্ধ হইতে পারিবে না।" সুদেষ্ণা এই বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"এরূপ হইলে আমি তোমাকে ইচ্ছানুরূপ বাস করাইব—তোমাকে কোন ক্রমেই উচ্ছিষ্ট স্পর্শ বা কাহারও পাদপ্রক্ষালন করিতে হইবে না।"

মহাভারতের কথা অমৃত সমান—কিন্তু নারী সম্বন্ধে এ কথা আমার অমৃত সমান লাগল না; প্রসন্ন শুনছিল, তা'রও লাগল না। নারী কি এত সন্দিগ্ধ—নারীর প্রতি এত অবিশ্বাসিনী যে, রূপবতী ললনার গৃহমধ্যে অবস্থিতি মাত্রে স্বামীর মন বিচলিত হ'য়ে সর্ব্বনাশের সূচনা করতে পারে এমন হীন কল্পনা তা'র মনে উদিত হওয়া সম্ভব? কিন্তু মানবচরিত্র জ্ঞানের বিশাল-বারিধিতুল্য—ব্যাসের অগাধ পাণ্ডিত্যে সন্দিহান হ'তেও পারলুম না। প্রসন্ন বল্লে—এটা মেয়ে-মানুষ মেয়ে-মানুষকে বিশ্বাস করে না, তা নয়; মেয়ে-মানুষ পুরুষকে বিশ্বাস করে না, এইমাত্র প্রমাণ হচ্চে। আমার সে কথায় মন উঠল না, কেননা, এ ত আর কলিযুগের কথা নয়; আর প্রসন্নর কথাই যদি সত্যি হয়, ত যুগে যুগে স্ত্রী স্ত্রীই আছে—আর পুরুষ পুরুষই থেকে গেছে; কেননা হাজারই নারী জেগে থাকুন, অজ্ঞাতকুলশীলা রূপবতী ললনা গৃহমধ্যে প্রবেশ কল্লে, স্বামীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ও তৎসঙ্গে অভ্যাগতার প্রতি সন্দেহ, তাঁর হৃদয় আচ্ছন্ন করে' দেবে! তবে সুদেষ্ণার মত অন্তরের আশঙ্কা স্পষ্ট

করে' ব্যক্ত করবার মত বলের হয় ত তাঁর অভাব হ'তে পারে।

আমি আরও একটু ভেবে দেখলুম—এ প্রকার গূঢ় সন্দেহের দ্বারা নারী যত সহজে নারীর অমর্য্যাদা করে, পুরুষ তত শীঘ্র পারে না; তথা-কথিত শিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা বিশেষ তারতম্য হয় না।

তারপর বিরাটরাজের শ্যালক মহাবল কীচক দেবতার ন্যায় বিচরণ-কারিণী দ্রৌপদীকে হঠাৎ নিরীক্ষণ করিয়া কুসুম-শরে প্রপীড়িত হইয়া, ভগিনী সুদেষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল—"শুভে! সুজাত-মদিরা-তুল্য-মোহকারিণী এই শোভন কামিনী কে?" সুদেষ্ণা ভ্রাতাকে তাহার পরিচয় দিলেন, এবং উভয়ের মিলন সাধন জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া উপদেশ দিলেন। কৌশলে সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের নিকেতনে প্রেরণাভিলাষে বলিলেন—"সৈরিন্ধ্রী, আমি পিপাসায় সাতিশয় ব্যথিতা হইয়াছি, অতএব তুমি শীঘ্র কীচকের গৃহে গমন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুরা আনয়ন কর।" সৈরিন্ধ্রী এই আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য বিরাট-মহিষীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না; তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে শঙ্কাপূর্ণ চিত্তে দৈবের শরণাপন্ন হইয়া কীচকের গৃহে প্রবেশ করিলেন। 'পার-গমনেচ্ছু ব্যক্তি নৌকালাভ করিলে যেমন আহ্লাদিত হয়' কীচক সেইরূপ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল।

এ কি চিত্র? ভ্রাতা, ভগিনী, আশ্রিতা কুলললনা, এ তিনের মধ্যে এ কি বীভৎস ব্যাপার? এ কি 'যা শত্রু পরে পরে'? স্বায়

প্রেমাস্পদের হৃদয়ে একাধিপত্য রক্ষা করবার মানসে, ভগিনী জেনে-শুনে আশ্রিতাকে পশুপ্রকৃতি ভ্রাতার কবলে প্রেরণ কল্লেন? এই কি অমৃত সমান কথার নমুনা, অথবা কথা সত্য এবং সত্যই একমাত্র অমৃত, সুমিষ্ট না হ'লেও।

কীচকের হস্তে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী রাজার শরণার্থিনী হইয়া রাজ-সভায় উপস্থিত; যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে কীচক তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। দ্রৌপদী আত্মগোপনকারী নিরুদ্বিগ্ন স্বামীগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"পতিব্রতা প্রেয়সীকে সূত-পুত্র কর্ত্তৃক বধ্যমানা দেখিয়াও যাঁহারা ক্লীবের ন্যায় সহ্য করিতেছেন — তাঁহাদের বীর্য্য ও তেজ কোথায় রহিল?' বিরাট-রাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"কীচককে দণ্ডিত না করায় আপনার রাজ-ধর্ম্ম দস্যু-ধর্ম্মের তুল্য হইতেছে।"

বিরাট কহিলেন, "তোমরা উভয়ে পরোক্ষে কিরূপে বিবাদ করিয়াছ তাহা আমি জানি না, তদ্বিষয়ের যাথার্থ্য অবগত না হইলে আমি কি প্রকারে বিচার-কৌশল প্রয়োগ করিতে পারি।" বিচার কৌশলের বিশেষত্বই এই। ফলে কোন প্রতীকার হইল না; যুধিষ্ঠির ক্রোধে প্রজ্জলিত হইলেও পত্নীকে বলিলেন—"যাঁহারা বীরপত্নী হ'ন পতির অনুরোধে তাঁহারা দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করেন। সামান্য নটীর ন্যায় নির্লজ্জা হইয়া রাজসভায় ক্রন্দন করা উচিত নহে; সভাসদগণের ক্রীড়ায় ব্যাঘাত হইতেছে, তুমি এখন যাও, গন্ধর্ব্বেরা সময় পাইলে বৈরনির্য্যাতন করিবেন।" এই প্রকার ইঙ্গিত করিয়া

যুধিষ্ঠির নির্য্যাতিতা পত্নীকে স্থানান্তরে যাইতে বলিলেন। যাইবার সময় সৈরিন্ধ্রী কহিলেন,—"আমি যাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণী বোধ হয় তাঁহারা অতিরিক্ত দয়াশীল!" রোষাবেগ বশত আরক্ত-নয়না আলুলায়িতকেশা কৃষ্ণা যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া রাজসভা ত্যাগ করিলেন।

"ভীমসেন ব্যতীত আমার মনঃপ্রীতি সম্পাদন করিতে আর কেহই সমর্থ হইবে না"—এই চিন্তা করিতে করিতে সৈরিন্ধ্রী, মৃগরাজবধূ যেমন দুর্গম বনে প্রসুপ্ত সিংহকে জাগরিত করে, তদ্রূপ ভীমসেনকে প্রবুদ্ধ করিলেন; বলিলেন,—"উঠুন, মৃতের ন্যায় কি প্রকারে নিদ্রিত রহিয়াছেন—আপনার ভার্য্যা অপমানিতা, পাপিষ্ঠ জীবিত, আপনি কেমন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন?"

দ্রৌপদী ভীমসেনের নিকট আপনার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া, সকল দুঃখ, সকল অপমানের কথা বলিয়া, পাপিষ্ঠের প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীমসেন ভার্য্যাকে শান্ত করিলেন এবং বৈরনির্য্যাতনের প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। পরদিন রাত্রিতে কীচককে গোপনে হত্যা করিলেন—কেননা তখনও পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পরিসমাপ্তি হয় নাই। কীচক নিপাতনে দ্রৌপদী সন্তাপরহিতা ও পরম আনন্দিতা হইলেন।

মহাভারতের সৈরিন্ধ্রীর ইতিহাস আলোচনা করতে করতে, আমার বর্ত্তমান কালের সৈরিন্ধ্রী বা সৈরিন্ধ্রীপদপ্রার্থিনী নারীগণের কথা স্বতই মনে হ'ল। এই বিরাট রাজ্যে আত্মগুপ্ত বা প্রকৃতই

ক্লীব-ধর্ম্মচারী পতিগণের নিদ্রালু অবস্থায়, নারীর সৈরিন্ধ্রীবৃত্তি সাতিশয় বিপদসঙ্কুল তা'র সন্দেহ নেই। দেশে ও সমাজে কীচক ও উপ-কীচকগণের কখনও অসদ্ভাব হবে না—যা দ্বাপরে হয় নি তা কলিতে হবে কেন? অতএব একদিকে বিচার কৌশল-প্রয়োগপটু রাজা ও ক্লীবধর্ম্মী পুরুষ, ও অপরদিকে পশুপ্রকৃতি কীচক ও উপকীচকগণ —এতদুভয়ের মধ্যে স্বৈরবিহারিণী নারীর বিপদ অনেক, একথা বিস্মৃত হ'লে চলবে না। দ্রৌপদীর মত তেজস্বিনী বিচক্ষণা রমণীরও যখন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য ভীমসেন ভিন্ন গতি ছিল না, তখন ভীমসেন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হ'য়ে, আধুনিক সৈরিন্ধ্রীগণ এই বিরাট রাজ্যে স্বৈরবিহারের স্বাধীনতার অভিলাষিনী হবেন না—কিন্তু আবার এ কথাও সত্য যে, এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যদি বিদেশীয় অনুকরণের বিকৃত পরিণাম বা বিলাসমাত্র না হয়—যদি নারী অন্তরের সহিত স্বৈরিণী হবার অভিলাষী হ'য়ে থাকেন, এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তা'র যথার্থ প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, তা হ'লে সূপকার নিদ্রিত ভীমসেনেরও নিদ্রাভঙ্গ হবে; নির্য্যাতিতা পত্নীর মান, সেই সঙ্গে নিজের মান, রাখবার জন্য তিনি স্বতঃ প্রবুদ্ধ হ'য়ে দণ্ডায়মান হবেন। নারী স্বৈরিণী হ'লে, তাঁর দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পেলও, তিনি কখনই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারবেন না।

প্রসন্ন বলিল—তা'র নিজের মান নিজের হাতে, তা'র ভীমার্জ্জুনের দরকার নেই, সম্মার্জ্জনীই যথেষ্ট।

২২

কামিনী কাঞ্চন

বুদ্ধদেব থেকে আরম্ভ করে' মহম্মদ, তারপর পরমহংসদেব পর্য্যন্ত কামিনীর প্রতি একান্ত বিমুখ। ভাষাটা যদি ভাবের আবরণ না হ'য়ে ভাবের অভিব্যক্তিই হয়, তা হ'লে কামিনী কথাটাতেই নারীর প্রতি চিরদিনের অশ্রদ্ধাই crystallised হ'য়ে রয়েছে। wo-man কথাতেই নাকি manএর woeই সূচনা করে। মাঝে মাঝে কবি, (যাঁকে কবিগুরু বাতুল বলেচেন) নারীকে ministering angel বলে' সুখ্যাতি করেচেন; কিন্তু সে কথায় নারীর কামিনী আখ্যা মুছে যায় নি, সংসারেও তা'র স্থান খুব প্রশস্ত হ'য়েও যায় নি। কিন্তু স্বর্গই বল আর সংসারই বল. নারী ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না, অতএব যতই হেনস্তা কর নারীকে একটা প্রকৃষ্ট স্থান দিয়ে রাখতেই হবে; সে স্থান কোথায় হবে তা' নিয়ে জগৎ জুড়ে একটা বিতণ্ডা চলেচে; শীঘ্রই পুরাতন ব্যবস্থার একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাবে বলে' মনে হয়। নারী মানুষ, সে আপনার একটা হেস্তনেস্ত করে' জগতের দরবারে আপনার স্থান করে' নেবে। কিন্তু কাঞ্চন সম্বন্ধে অন্য কথা।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্। এই ত কাঞ্চনের প্রতি সনাতন গালাগাল। আমার মনে হয় একথা যিনি বলেছিলেন তিনি আমারই

মত অর্থহীন নিরর্থক জীবন যাপন করে', "দ্রাক্ষাফল হয় অতিশয় অম্লরসে পরিপূর্ণ" বলে' আপনার মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন। যিনি সে ফলের ঝুড়ি নিয়ে বসে' তা'র রসাস্বাদ করবার সুযোগ পেয়েছেন—তাঁর মুখে দ্রাক্ষাফলের মিষ্টত্ব, স্নিগ্ধত্ব, পুষ্টিকারিত্ব ইত্যাদি গুণেরই ব্যাখ্যা শুন্‌তে পাওয়া গেছে; আর যাঁরা সে রসে বঞ্চিত, অধিকাংশক্ষেত্রে তাঁদেরই মুখে স্তুতির পরিবর্ত্তে নিন্দাই উদ্‌ঘোষিত হয়েচে।

অর্থ অনর্থের মূল, হয়ত এক সময়ে ছিল; যখন দেশে চোর-ডাকাতের ভয় বেশী ছিল—যখন সুধু ধন নয়, ধনাপবাদেও ডাকাত পড়ত, যখন টাকা থাকলে দেশের রাজার পর্য্যন্ত চক্ষু-পীড়া উপস্থিত হ'ত। অর্থ সম্বন্ধে সে অনিশ্চিততা এখন নেই; এখন অর্থকে অনর্থ বললে চলবে কেন?

আমি ত দেখিচি অর্থ অপেক্ষা চিরস্থায়ী জিনিষ আর নেই। মানুষ যায়, তা'র বিদ্যা বুদ্ধি, তা'র জ্ঞান, তা'র পাণ্ডিত্য, তা'র সঙ্গে লোপ পায় (খানিকটা সে জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের প্রতিচ্ছবি হয়ত ছাপা কাগজে কিছুদিনের জন্য থেকে যায়), কিন্তু তা'র সঞ্চিত অর্থ অমর হ'য়ে যুগ যুগান্তর থাকতে পারে। তার ধর্ম্মপ্রাণতা, তা'র দেহের সঙ্গে ভস্ম হ'য়ে যায়; কিছুদিন হয়ত তা'র সুনামের সুরভি বন্ধু-জনের হৃদয়-মন সুরভিত করে' রাখে; কিন্তু তা'র সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত অর্থ যদি থাকে, ত সে পুরুষানুক্রমে তা'র স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখতে পারে; তা'র পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বুদ্ধি, বিচক্ষণতার সমবায়ে যে অর্থ সঞ্চিত হয়েছিল, সেই অর্থ একটা বিরাট potential energyর

power-house হ'য়ে বেঁচে থাকতে পারে ; এবং সে potential energy কোনদিন kinetic energyতে পরিণত হ'য়ে, সঞ্চয়-কারীর পরিশ্রম অধ্যবসায় বুদ্ধি বিচক্ষণতার পুনর্জন্ম হ'তে পারে।

সকলেই জানে এবং আমিও জানি যে, অর্থ অনর্থ হ'য়ে উঠে যখন সে অবস্তুতে বস্তুত্ব আরোপ করে, অপদার্থকে পদার্থত্ব দেয় ; সমাজে ও রাষ্ট্র মধ্যে relative ও absolute value উল্টে-পাল্টে দেয়। কিন্তু সেটা অর্থের দোষ নয়, জগতের দোষ, অর্থাৎ মানুষের মনের দোষ। আমি দেখিচি যে, অর্থ না থাকলে বন্ধু মিলে না ; কবি বলেচেন "কড়ি বিনা বন্ধু কই"। অর্থ থাকলে অনেক অনর্থ সমাজে সম্ভব হয়—ঘটেও ; "কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়ি লাগি মরে গিয়া, কড়িতে কুলবতী মজে"—সে সব সত্য। কিন্তু কড়িতে অসম্ভবও সম্ভব হয়—"কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।" আমি আরও দেখিচি যে অর্থের অত্যাচার, অর্থের ব্যভিচার যা কিছু, সঞ্চয়কারীর দ্বারা খুব অল্পই হ'য়ে থাকে। যে বুদ্ধিবিচক্ষণতার দ্বারা অর্থ সঞ্চয় হয়, সেই বুদ্ধিবিচক্ষণতাই তা'কে ব্যভিচার হ'তে রক্ষা করে ; ব্যভিচার আসে নিম্নতর পর্য্যায়ে, যখন মানুষ "বাবা কি কল করেচে, সই করলেই টাকা" বলে' চেক বা দাখিলা সই করে', আর আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত ভুতে টাকা এনে দেয়। সঞ্চয়ীর যে গুণ তা' ব্যভিচারকে দূরে রেখে দেয়। যে সঞ্চয় করে না, সুধু সঞ্চিত বিত্ত ব্যয় করে, তা'র সে বাঁধ থাকে না, সে স্বতই উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে যাবে তা'র আর আশ্চর্য্য কি? পাণ্ডিত্যের বিদ্যাবত্তার দিক দিয়েও ত এই দোষ দেখা যায়। পণ্ডিতের পুত্র মূর্খ, কিন্তু

বাবার দোহাই দিয়ে তরে' যাবার চেষ্টা তা'রও হয়, এ ত শত শত রয়েছে। "আমার বাবার টোল ছিল—আমি মূর্খ ?" এ আস্ফালন ত অনেক মূর্খের মুখে শুনা যায়; পাণ্ডিত্যের ফল যদি কিছু মাত্রও উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রে অর্শা'ত তা হ'লে, অর্থবানের পুত্রের যে দর্প, সেটা খুব অনন্যসাধারণ হ'ত না।

আমি কাঞ্চনের স্বপক্ষে এত কথা বলচি তা'র প্রধান কারণ আমার বিশ্বাস আমরা গরীব হয়েছি বলে' ধনীর প্রতি ও ধনের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করতে আরম্ভ করেচি। তা'তে কিছুই এসে যেত না, যদি আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে, ধনীর সঙ্গে ও ধনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে না হ'ত। আমরা যেমন ন্যাংটা, বাটপাড়ের ভয় রাখি না, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীও যদি ন্যাংটা হ'ত, তা হ'লে Soul-force দিয়ে ভারতউদ্ধার হ'য়ে যেত। কিন্তু অবস্থা তা নয়; আমাদের Soul-force দিয়ে Sole-force বা Kick-forceএর বেগ ধারণ কর্ত্তে হচ্চে। এখানে সুতরাং আমাদের Sole-forceএরই আপাততঃ অধিক দরকার; একথা Soul-forceএর ঋষি পাকেপ্রকারে স্বীকারই করেছেন—এক কোটী টাকা, আর এক লক্ষ স্বেচ্ছা-সেবকের ফরমায়েস করে'। এক কোটী টাকা ত Soul-force নয়ই, আর হাত-পা বিশিষ্ট এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকও নিছক Soul-forceএর dynamo নয়।

যন্ত্রটার এক প্রান্তে Soul-force অপর প্রান্তে Sole-force ব Kick-force—একটাকে পরিচালন জন্য, লক্ষ্য স্থির করে' প্রয়োগ করবার জন্য, আর-একটা'র প্রয়োজন—driverএর Soul-force

আর boilerএর horse-power এই দুইএর সমবায় না হ'লে কোন forceই কাজের হবে না।

অতএব যতটা soul-forceএর গুণ-গরিমার প্রচার করা হচ্চে, যাতে sole-force ততটা বাড়ে, তা'র প্রয়োজনীয়তারও ততখানি প্রচার করা হ'ক—কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর, অর্থকে অনর্থ ভাব, এ সব কথা তুলে রেখে দিয়ে, এই কথাই বলা হ'ক যে, প্রত্যেক যুবা পুরুষকে দেশসেবার জন্য তথা আপনার সেবার জন্য, অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ-সাধনা কর্ত্তে হবে। টাকা রোজকার কর্ত্তে হ'বে, কর্ম্মযোগের অঙ্গস্বরূপ অর্থ-যোগ করতে হবে। না হ'লে সব কর্ম্মযোগ কর্ম্মভোগে পরিণত হবে, আর সব ত্যাগই প্রাণ-ত্যাগে শেষ হ'য়ে যাবে। Non-co-operationই করুন আর co-operationই করুন, উভয়বিধ পন্থায় অর্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে—আর সে অর্থ সুধু ভিক্ষা বৃত্তি করে' অর্জ্জন করা যাবে না। এই যে জার্ম্মাণ জাতি non-co-operation করে' ফ্রান্সের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করচে, তা'র জন্য কত কোটি অর্থব্যয় হচ্চে তা'র ঠিক আছে! গায়ের জোরে অসমর্থ হলে, অর্থের জোরে এখনও জার্ম্মাণি টিকে আছে—যে-মুহূর্ত্তে সে জোর শেষ হবে, সেই মুহূর্ত্তেই ফ্রান্সের পায়ে লুটিয়ে পড়তে হ'বে। Soul-force,—patriotism বা দেশাত্ম বোধ, বা discipline যাই বলুন, এ সব যে নেই তা নয়; তবে এ সমস্তই অর্থের খোঁটার জোরে দাঁড়িয়ে আছে; এই অর্থের খোঁটা ধরে' এখনও জার্ম্মাণ মেড়া লড়চে, এ খোঁটা ভাঙ্গলে তা'র এ লড়াই শেষ হ'য়ে যাবে। তাই বলচি—অর্থমনর্থম্ এ ভ্রান্ত উপদেশ

দেওয়া বন্ধ করে' দেওয়া হ'ক ; ভিক্ষুক—spiritual হ'ক বা material হ'ক, আমাদের দেশে আর এক মুহূর্ত্ত থাকা নয় ; অর্থ উপার্জ্জন কর, ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি কর, জাতীয় অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ কর। অন্ততঃ ধনের খাতিরেও সকলে তোমাদের সম্মান করবে—ভয় করবে।

২৩

বাসাংসি জীর্ণানি

পাগলা মাখম বলেছিল—"কাপড়ের ভিতর তুইও নেংট, আমিও নেংট, সবাই নেংট"; তা'তে মেচোহাটার মেচুনি বেটি তা'র গায়ে আঁস-জল ছিটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কথাটা সত্যি; নিছক মানুষটা উলঙ্গই বটে, তা'র কোমরের কাপড়খানা বা পাজামাটা মানুষ নয়, মানুষটাকে ঢেকে রাখবারই যন্ত্রবিশেষ।

শাস্ত্র বলেচেন—মৃত্যু মানে কাপড় ছাড়া, পুরাতন ছেড়ে নূতন কাপড় পরিধান করা; এ কথার ভিতর একটু রহস্য র'য়ে গেছে। যেটা মানুষ, যেটা সত্যিকারের তুমি বা আমি, যেটা উলঙ্গ নিরুপাধিক আত্মা, সেটা ঠিক উলঙ্গই থেকে যায়; কণ্ঠী নামাবলি, আচকান টুপী, হ্যাট কোট, পাগড়ী পায়জামা পরা মনুষ্যদেহের ভিতর দিয়ে সেটা উলঙ্গই থেকে চলে' যায়, সেটার বিকৃতিও হয় না, পরিবর্ত্তনও হয় না।

কাপড়ের ভিতর তুমি আমি উলঙ্গ থাকলেও, পরিচ্ছদের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হ'য়ে যায়; তোমার আমার প্রকৃতির, সংস্কারের, mentalityর ছাপ পরিধেয়ের উপর ফুটে ওঠে। আমি শুনেচি যীশুখৃষ্টকে ক্রস্ থেকে নামিয়ে যে পরিচ্ছদে ঢাকা দিয়েছিল, সেটা

এখনও Vaticanএ যত্ন করে' একটা আধারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েচে ; বৎসরে একবার সে আধারটা খোলা হয়। কয়েক বৎসর আগে একবার একজন ফটোগ্রাফার সেই পরিচ্ছদটার ফটো নেন ; প্লেটখানা develope করে' দেখা গেল—সেই পরিচ্ছদের মধ্যে একটা মানুষের মূর্ত্তির স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। হ'তে পারে এটা একটা photographic jugglery, কিন্তু আমার বিশ্বাস মানুষটার দেহের ছাপটা এতদিন তা'র পরিচ্ছদে লেগে থাক আর নাই থাক, কিন্তু মানুষটার মনের ছাপ তা'র পোষাকে ছিলই ছিল ; আর, কতখানি মনের রাজ্য আর কতখানি দেহের রাজ্য তা'ত এখনও সঠিক বলা যাচ্চে না। যাই হ'ক, মানুষ যখন তা'র পোষাকের ভঙ্গীটা বদলে ফেলে, তখন বুঝতে হবে যে তা'র মনও বদলে গেছে, পুরাতন মানুষটা মরে গেছে ; এবং সকল মরার পরই যখন বাঁচা আরম্ভ, তখনই সেই মরা-বাঁচার সন্ধিস্থলেই অতর্কিতে সে, সাপের খোলসছাড়ার মত, বাসাংসি জীর্ণানি ত্যাগ করে' "নবানি" গ্রহণ করতে আরম্ভ করেচে ; আর পুরাতন ও নূতন উভয়বিধ পরিচ্ছদেই তা'রই মনের ছাপ থেকে গেছে। অতএব কথাটা উল্টেপাল্টে দুই রকম করে'ই বলা চলে—মরা মানে কাপড় ছাড়া, আর কাপড় ছাড়া মানেই মরা, তথা নূতন জীবনের আরম্ভ ও নূতন পরিচ্ছদ পরিগ্রহ।

ব্যক্তিগত ভাবে একটা মানুষের পক্ষে এ কথাটা যেমন সত্য, মনুষ্য গোষ্ঠী বা সমাজ অথবা জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। আমরা যুগে যুগে কতবার কত রকমই পোষাক বদলালুম তা'র কি ইয়ত্তা আছে ; আবার এক যুগেই কত রকম ভোল ফেরালুম তা'রই বা

নির্ণয় কে করে! আমার দেখতাই ত হ্যাট কোট থেকে গান্ধী-টুপী পর্য্যন্ত চলে' গেল। কিন্তু সেটা স্বতন্ত্র রকমের জিনিষ, সেটাকে fashion মাত্র বলা যায়—সেটা যাত্রার দলের সং-সাজা বলতে পারা যায়; সেটা মাত্র খেয়াল; আসরের বাইরে এসে "যে কেলো, সেই কেলো"—তা'র কথা বলচি না। যখন সমগ্র জাতটা একটা নূতন পোষাক পরে, একটা নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করে—তখনই মরা-বাঁচার কথা আসতে পারে।

আমাদের গ্রামের জমিদার বাবুর বড় ঘরে—যা'কে তোমরা drawing-room বল—তাঁর চার পুরুষের ছবি টাঙ্গান আছে। তাঁর প্রপিতামহ-ঠাকুর মুসলমানী কায়দায় সজ্জিত—মাথায় নাপিতের টুপির মত টুপি, পা পর্য্যন্ত লম্বা কাবা, কোমরে চাপরাসীদের মত দড়ার কোমরবন্ধ, চুড়িদার পায়জামা, পায়ে নাগরা জুতা, হাতে শটকার নল, পকেট থেকে রঙ্গীন রেশমী রুমাল ঝুলছে। পিতামহ শামলা মাথায়, চোগা চাপকান, পেণ্টুলান, পৃষ্ঠে শালের ত্রিকোণ রুমাল, ইংরেজী রৌপ্য-বগলস দেওয়া জুতা পরিহিত। পিতা riding-suit, হাতে চাবুক, পায়ে top-boot, পার্শ্বে সুসজ্জিত ঘোড়া দণ্ডায়মান। জমিদার বাবু স্বয়ং, চুনট্‌করা আদ্ধির পাঞ্জাবী, ফরাস-ডাঙ্গার মিহি translucent ধুতি, পায়ে লপেটা। এই যে চার পুরুষের চার রকমের পোষাক, এ চার রকমের মৃত্যুরই লক্ষণ। কেউ কেউ বলবেন ওটা আমাদের জাতের স্বধর্ম্ম—এখনি যদি "চিনে মালাই ফট" এসে আমাদের দেশটা দখল করে' বসে, আমরা অমনি চুড়িদার ছেড়ে কেলিকোর চায়না কোট ধরব, কাটের জুতা

পরব, টিকী রাখব, আর নস্যি, moving cheeseএর চেয়েও অতি উপাদেয় বলে, খেতে আরম্ভ করব। কিন্তু তা'তে আমার প্রস্তাবের সমর্থন করে' আর-একটা ঘটনার উল্লেখ করাই হবে, অর্থাৎ আমরা আর-একবার মরব, এইটেই প্রমাণ হবে মাত্র।

কাটা কাপড়ের পরিচ্ছদ ছাড়া আর একটা অদৃশ্য পরিচ্ছদ আছে, যেটা মানুষের মনটাকে আরও গভীরতর ভাবে ঢেকে রাখে – যা'র প্রভাব তা'র পোষাকে ত ব্যক্ত হয়ই—তা'র চোখে মুখে, কথায় বার্ত্তায়, হাসিতে কাশিতে, কাজে অকাজে পর্য্যন্ত ফুটে ওঠে—সে পরিচ্ছদ বা প্রচ্ছদের নাম গতানুগতিকতা, tradition, custom ইত্যাদি।

সব গতানুগতিকতার প্রারম্ভে একটা বিশিষ্ট হেতুবাদ ছিল, একটা raison d'etre ছিল, এটা কল্পনা করা অন্যায় হবে না। হয়ত সে হেতুবাদ পণ্ডিত গোষ্ঠীর মনের ভিতর লুক্কায়িত থাকলেও খুব স্পষ্টই ছিল। কিন্তু লুকোচুরীর মধ্যে, কালক্রমে সে হেতুবাদ ঝাপসা হ'য়ে এল, ক্রমে পণ্ডিতদের মন থেকেও সেটা উপে গেল। তখন "বিয়েয় বেরাল বাঁধার" মত সেটা একটা অপরিজ্ঞাত হেঁয়ালী-মাত্রে পর্য্যবসিত হ'ল; "এটা কর কেন" জিজ্ঞাসা কল্লে সকলেই বল্‌তে আরম্ভ কল্লে—"ওটা করতে হয়"। "যদি না করি তা হ'লে কি হয়?" তা'র উত্তরে কোন গূঢ় অকল্যাণের ভয় প্রদর্শন করা হ'ল। ব্যাপার এইখানে এসে দাঁড়াল—"হয়" আর "ভয়ের" রাজ্য চলতে লাগল। ভূতচতুর্দ্দশীতে চৌদ্দ প্রদীপ কেন দিতে হয়, আর চৌদ্দ শাক কেন খেতে হয়, তা'র উত্তর—"হয়, নইলে ভূতে ধরে", নয়ত

একটা আজগুবি electricity ঘটিত ব্যাখ্যা, নয়ত গালাগাল।

এই 'হয়' আর 'ভয়ের' জ্বালায় দেশটা ঝালাপালা হয়েচে; অতএব জানবে আর দেরী নেই, 'কাপড় ছাড়বার' সময় হ'য়ে এসেচে, বহুদিনের জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে' নববস্ত্র পরিধানের সময় এসেছে, খোলস্ ছেড়ে নবজীবন আরম্ভ হ'তে চলেচে, দুর্ব্বল দুর্ব্বাক্যের আঘাতে তা'কে আর আটক করতে পারবে না।

ভারতের যুগে যুগে এই রকমই হয়েচে। অজ্ঞানতার মহাপ্লাবন থেকে বেদের অর্থাৎ জ্ঞানের উদ্ধার—সে জ্ঞানের দিব্যজ্যোতি যখন আবার যজ্ঞের ধূমে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে নিষ্প্রভ হ'য়েচে, তখন বুদ্ধ প্রবুদ্ধ হয়েচেন। আবার চারিদিকে অজ্ঞানতা, নিরর্থক গতানুগতিকতার প্রভাব বিস্তৃত হ'য়ে জাতটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে উঠেচে, অর্থহীন 'হয়'কে নয় করতে প্রস্তুত হ'য়েচে, ভয়কে শিরোধার্য্য করে' নিতে রাজী হচ্চে না; প্রতি কথায় 'কেন' জিজ্ঞাসা কর্ত্তে সুরু করেচে, সদুত্তর না পেলে 'হয়' আর 'ভয়'কে যুগপৎ জলাঞ্জলি দিয়ে নব পরিচ্ছদে—যুক্তির জ্ঞানের নির্ভীকতার স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচ্ছদে, বিভূষিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠবে।

একদিকে গুরু দেবতা আর-একদিকে কুম্ভীপাক নরক, এই দুই-এর জোরে এতাবৎকাল সমাজনেতৃগণ সমাজটাকে মুঠোর ভেতর করে' রেখেছিলেন; এখন হাতের চেয়ে আম বড় হ'য়ে উঠেছে, আর কুম্ভীপাকটাকে মোটেই লোকে মানতে চাচ্চে না। এখন যাকে মানতে চাচ্চে, অর্থাৎ যুক্তিকে ও জ্ঞানকে, সেটা গুরুদেবতাগণের মোটের উপর খুবই অভাব হ'য়ে পড়েচে। তাঁদের এখন সম্বলের মধ্যে

গালাগাল, যে কেহ তাঁদের বিরোধী—যাহা কিছু তাঁদের বিরোধী—তা'র প্রতি অজস্র গালিবর্ষণই তাঁদের বল। তাঁরা বুঝতে পারচেন না যে, 'হয়' আর 'ভয়ের' দ্বারা আর রাজত্ব করা চলচে না; দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ইংরাজ রাজের তা চলচে না, তাঁকেও কাউন্সিলের মধ্যে ও কাউন্সিলের বাইরে কৈফিয়ত দিতে হচ্চে, লোকের মত জান্‌তে হচ্চে, বুঝতে হচ্চে, বোঝাতে হচ্চে।

ঠিক এই পর্য্যন্ত এসে পৌঁছিচি, এমন সময় প্রসন্ন এসে পাশে দাঁড়াল; আমাকে দপ্তর নিয়ে বস্‌তে দেখলে প্রসন্ন বিরক্ত হ'ত, হাজার হ'ক গয়লার মেয়ে, দপ্তরের মাহাত্ম্য সে কি বুঝবে! যাই হ'ক আমি বল্লাম—প্রসন্ন শোন আমি কি লিখলুম—বাসাংসি জীর্ণানি—

প্রসন্ন। ও আবার কি? ওটা কোন্ দেশের ভাষা?

আমি। এই দেশেরই ভাষা, দেবভাষা—সংস্কৃত ভাষা—

প্রসন্ন। ওর মানে কি?

আমি। মানে জিজ্ঞাসা করচ তুমিও? আচ্ছা বল্‌চি—মানে ছেঁড়া কাপড়—

প্রসন্ন। ছেঁড়া কাপড় নিয়ে তোমার কি কাজ? ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ত আমরা বাসন কিনি। তা যা হ'ক, ছেঁড়া কাপড় বল্লেই ত হ'ত; যা লোকে বুঝবে না এমন কথা না বল্লেই ত হ'ত।

আমি। তাই কি হ'ত? ছেঁড়া কাপড় বল্লেই ত তোমার বাসনকেনার কথা মনে আসত; আমার এ বাসাংসি জীর্ণানিতে বাসন-কেনার ব্যাপার মোটেই নেই।

প্রসন্ন। আমার ও-সবে দরকার নেই, তুমি বল্‌বে এক, আর বোঝাতে চাইবে আর-এক, অত ঘোরফের আমি বুঝি না; সোজাসুজি যা বুঝি, সোজা করে' বল, আমি শুনতে রাজি আছি।

আমি। তা হ'লে তোমার শাস্ত্র-কথা শুনা হ'তে পারে না, তুমি যেমন আছ তেমনি থাক।

২৪

নারীর শত্রু

আমি চিরদিন শুনে আসচি—নারীর নির্য্যাতন পুরুষে করে, শাস্ত্রে, লোকাচারে, পুরুষই ইহপরকালে নারীর চির শত্রুরূপে বিদ্যমান। একথা কোন কোন পুরুষের মুখেও প্রকাশ হয়েচে এবং এখন নারীও ঐ কথাই বল্‌তে সুরু করেচে। কিন্তু কথাটা একদম মিথ্যা কথা। নারীর শত্রু নারী, পুরুষ নয়; তা'র আমি প্রমাণ দেব।

আসামী কবুল দিলেই যে তা'র নিরপরাধিতা প্রমাণ করা যায় না তা নয়, যাঁরা Evidence Act পড়েচেন তাঁরা তা জানেন। কবুলই যদি শেষ প্রমাণ হ'ত, তা হ'লে সাক্ষী সাবুদের হাঙ্গামা একেবারে উঠে যেত, সুধু কবুলের উপরেই ফাঁসী হ'য়ে যেত। তবে কবুল করলে, নিরপরাধিতা প্রমাণ করা কিছু শক্ত হ'য়ে পড়ে এই-মাত্র। কবুলটা কাটানর জন্য দেখাতে হয় যে, অনেক সময় অপরাধ না করেও মানুষ কবুল করে, অনেক সময় অপরের বোঝা নিজের ঘাড়ে নেবার জন্য লোকে কবুল করেচে এমন ঘটনা অনেক ঘটেচে, নির্য্যাতনের চোটে মিথ্যা কবুল করাটাই সোজা পথ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রকম করে' কবুলকারীর অনুকূলে অন্ততঃ benefit of doubt এনে দিতে হয়। এক্ষেত্রে যদি আমি আসামী পুরুষের

পক্ষে সেটাও কর্ত্তে পারি, তা হ'লেও তা'কে অব্যাহতি দিতে হবে। আর যদি কবুল করা সত্বেও আমি প্রকৃত অপরাধীকে দেখিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে পুরুষকে honourably acquit কর্ত্তে হ'বে।

নারীর প্রধানতঃ তিনটী অবস্থা আমি কল্পনা করে' নিলুম—কন্যা, বধূ, গৃহিণী। আদিম মনুষ্য থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত যুগে যুগে নারীর সমাজে স্থান নির্দ্দেশ কর্ত্তে কর্ত্তে নেমে এসে, বর্ত্তমান সমাজে নারী সম্বন্ধে ব্যবস্থার আলোচনা করব না—এ historical survey থেকে আমার বিশেষ কোন লাভ হবে না—যুগে যুগে, মোটের উপর আমাদের দেশে নারীর একই অবস্থা।

আমি বধূ থেকেই আরম্ভ করি, ক্রমে চক্রটা পূর্ণ করে' কন্যায় এসে শেষ করব। পুত্র বিবাহ কর্ত্তে যাচ্চেন, দ্বার-দেশে পালকী, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী বা মোটরকার দাঁড়িয়ে; বর যাত্রা কর্ব্বেন। শঙ্খধ্বনির (কবি বলেছেন,—শাঁক নয় রোদন-ধ্বনি) মধ্যে মাতা প্রশ্ন কল্লেন—বাবা কোথায় যাচ্চ? পুত্র উত্তর দিলেন—মা তোমার দাসী আনতে যাচ্চি। মাতা আশীর্ব্বাদ কল্লেন; বর দুর্গা বলে' যাত্রা কল্লেন। এই ত সুরু—এই যে সুর বেঁধে দিলেন মাতাঠাকুরাণী, সেই সুরেই গাওনা চলল, বধূ-জীবনের শেষ পর্য্যন্ত—তা সে শেষটা কেরোসিনেই হ'ক, বা শ্বশ্রু-ঠাকুরাণীর পরলোক গমনেই হ'ক, অথবা শ্বশুরঠাকুরের পরলোক গমনের পর, শ্বশ্রু-ঠাকুরাণীর dowagerত্ব প্রাপ্তিতেই হ'ক।

সালঙ্কৃতা, সবস্ত্রা, কাঞ্চন মূল্য সমেতা, সোপকরণা দাসী নিয়ে বাবাজীবন বাড়ী ফিরলেন। বাবাজীবনেরা প্রায় সকলেই, এই

বিবাহ ব্যাপারে এবং শুভপরিণয়ের কিছুদিন পর পর্য্যন্তও, মাতা-ঠাকুরাণীর তথা পিতা ঠাকুরের বড়ই "ন্যাওটো" হ'য়ে থাকেন; কেননা তখনও তিনি পিতার অন্নে পরিপুষ্ট, নিজে উপায়ক্ষম নহেন; হয়ত সবে মাত্র দু'টা পাশ করেচেন, এবং আর দুটা পা'শ কর্ত্তে কর্ত্তে দু'টী কন্যার পিতা হ'য়ে পড়লেন; সুতরাং অন্য কোন বিষয়ে না হ'লেও, কলত্র ও কন্যাগণের ভরণপোষণের জন্য পিতা-মাতার একান্ত আজ্ঞাবাহী হওয়া ভিন্ন তাঁর গতি কি? দাসী আনতে যাচ্চি বলে' যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, পরিণীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে, অশেষ মাতৃভক্তি প্রদর্শন দ্বারা ইহপরলোকের কল্যাণ অর্জ্জন করা, তাঁর খুবই প্রয়োজন হ'য়ে থাকে। পরিণীতার প্রতি তাঁর যে কর্ত্তব্য, তা'র সম্বন্ধে তাঁর যে দায়িত্ব, সে সব শিকেয় তোলা থাকে; কেন না তিনি স্বয়ং ভর্ত্তা হ'লে কি হয়, নিজের ভরণ পোষণের জন্য তিনি পিতার মুখাপেক্ষী—ছেলের বাপ হ'লে কি হয়; তিনি তখন বাপের ছেলে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারেন না, তিনি আবার কি করে' পরিণীতার বোঝা বইবেন; তিনি তখনও "স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যং সাধয়তি"। অতএব যাঁর দাসী তাঁর হাতে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

এই যে "শ্বাশুড়ী" যিনি (কবি বলেচেন) "কলিতে অমর", অর্থাৎ যিনি যুগে যুগে একই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' বর্ত্তমান,—যিনি ছেলের মা, সুতরাং অপর মায়ের সন্তানের উপর যাঁর শাসন দণ্ড সতত উদ্যত হ'য়েই আছে—যিনি হয় ত মাতৃরূপে অন্নপূর্ণা, স্ত্রীরূপে

"সচিবঃ সখী", ভগিনীরূপে স্নেহের প্রস্রবণ, কন্যারূপে কল্যাণরূপিণী —তিনি কোন্ অভিশাপের বশে, শ্বশ্রুরূপে জ্বালাময়ী অগ্নিশিখার মত সংসার-অরণ্যে দাবানলের সৃষ্টি করে', বন্য-কুরঙ্গিনী বধূজনকে দগ্ধ করে' মারেন, তা বিধাতাপুরুষই বলতে পারেন! খুব সৌভাগ্যবতী হ'লেও শ্বাশুড়ীর হাতে বধূজনের নিগ্রহ আছেই; সে নিগ্রহের প্রকৃতি Penal codeএর ভিতর সকল সময় না পড়লেও, সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ "বরিষার বারিধারা প্রায়", সততই ঝরতে থাকে; কবির কথায়, "উঠতে খোঁটা বস্‌তে খোঁটা শুন্‌বি সাঁজ সকাল"—তা হ'তে অব্যাহতি নেই।

কেহ কেহ বলতে পারেন যে শ্বাশুড়ী মাত্রেই কি বধূ নির্য্যাতন করেন? আমি বলি করবার ত কথা, তবে যদি কোন স্থানে তা'র অভাব হয়, তা'র বিশেষ কারণ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বিচক্ষণতা, তাঁর বিবেক বুদ্ধি বা সহৃদয়তা নয়; বাক্যের প্রস্রবণ যদি না ছোটে, সেটা বাইরের কোন উপলখণ্ড স্রোতের মুখ বন্ধ করার জন্য, জলের বেগের অভাব হেতু নয়। আমি সাধারণ নিয়ম বল্লুম, তা'র ব্যতিক্রম যদি কোথাও হয়, তা'র কারণ বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করলে শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর প্রকৃতির বাহিরে কোথাও পাওয়া যাবে, তাঁর ভিতর পাওয়া যাবে না।

মা'র মত স্নেহময়ী শ্বাশুড়ী কি হয় না? আমি বলব সেটা নারীর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। নারী কারো "মত" হ'তে পারে না, হয় মা হবে, না-হয় মা হবে না,—সৎমা হবে, মা'র "মত" হ'তে পারবে না। হয় স্নেহময়ী মাতা, নয়ত বিষধরী বিমাতা; হয় নারী তোমাকে ভালো-

বাসবে, না হয়, তোমাকে "দুটি-চক্ষের বিষ" দেখবে ; মাঝামাঝি কিছু হওয়া তা'র প্রকৃতি নয় ; সুতরাং শ্বাশুড়ী যখন নববধূর মা ন'ন, তার মা'র "মত" হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তিনি তা'র বিমাতাই হবেন ; আর সৎমা আর শ্বাশুড়ী একই পদার্থ, একটু উল্টাপাল্টা।

মাতা পুত্রবৎসলা, পিতা কন্যাবৎসল, ইহাই biological সত্য। পুত্রবৎসলা মাতা দেখেন, যৌনধর্ম্মের নির্ম্মম নিয়মে স্নেহাস্পদ পুত্র অপর নারীর স্নেহের পাত্র, অপর নারীকে স্নেহের ভাগ দিচ্ছে, নারী হ'য়ে মাতা তা সহ্য করতে পারেন না। স্বামী পত্ন্যন্তর গ্রহণ করলে তাঁর মনে যে ভাব হয়, স্নেহময় পুত্র অন্য নারীর স্নেহাস্পদ হ'লে তা'র অনুরূপ ভাব মাতার মনে উপস্থিত হয়। কথাটা যে রকমই শুনাক, সত্য কথা। আমাদের মেয়েলী-ছড়ায় আছে—

মেয়ে বিয়োলাম পরকে দিলাম
ছেলে বিয়োলাম পরকে দিলাম

এই হা-হুতাশের ভিতর "পরকে" দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার ভাব নেই, নির্ম্মম অন্তর্দাহেরই উচ্ছ্বাস আছে মাত্র।

তারপর শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী যে-মেয়েটী বিইয়েচেন, সেটী তাঁর নাড়ী-ছেঁড়া রত্ন, তাঁতে আর "পরের মেয়েতে" ত তুলনাই হ'তে পারবে না। তিনি যদি দোহন-কার্য্য শেষ করে' থাকেন, অর্থাৎ বিবাহিত হ'য়ে থাকেন ত তিনি বাপের বাড়ির বন্ধন থেকে মুক্ত, সুতরাং তাঁর নববধূর সম্বন্ধে কার্য্যের বাঁধও মুক্ত। স্নেহময় ভ্রাতা,

যার সঙ্গে তিনি একসঙ্গে খেলা করেছেন, এক সঙ্গে জীবন যাপন করেছেন, আজ বিয়ে হ'য়ে কি তিনি পর হ'য়ে গেছেন যে, শৈশবের ক্রীড়া-সঙ্গী ভাইটীকে একজন "পর" এসে একচেটে করে' নেবে, এবং স্নেহের স্রোতটা অপরদিকে চলে' যাবে বা তা'র তীব্রতাটা হ্রাস হ'য়ে যাবে? তিনিও নারী, সুতরাং (নারীর মন ভাঙ্গল ত একেবারে দুখানা) তিনি ক্রমে সনাতন মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন, "ননদিনী রাই বাঘিনী" হ'য়ে বসলেন। তাঁর এই বর্ণনাটা আজকের নয়। ননদিনী যদি অবিবাহিতা থাকেন তা হ'লেও —ধানি লঙ্কা, ক্ষুদ্র বলে' ঝালের অভাব হয় না।

পুত্র এই সকল মেয়েলী কথায় কান দিতে পারেন না, তা'র কারণ পূর্ব্বে বলেছি; পুত্রের পিতাও অন্তঃপুরটা গৃহিণীর স্বাধিকার বলে' কোন কথা ক'ন না; এবং কথা কওয়াটা যে সম্পূর্ণ নিরাপদ তা'ও নয়। বধূর পক্ষ অবলম্বন করে' কোন কর্ত্তা যে গৃহ সংসারের শান্তি বা স্বস্তির সহায়তা কর্ত্তে পেরেচেন, তা'র প্রমাণ আমার জানা নেই; পরন্তু confusion worse confoundedই হ'য়ে উঠেচে; সুতরাং "বোবার শত্রু নেই" এই উপদেশই তিনি সাধারণত অনুসরণ করে' থাকেন।

যাই হ'ক, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী তথা তাঁর কন্যারত্নের এই সকল ব্যবহার কেউ ভোলে না, বধূটী ত নয়ই। পুরুষ-মানুষ শুনিচি লড়াই ঝগড়ার পর গাঢ়তর বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ হয়েচে —কিন্তু নারী তা কখনও হয় নি, Forgive and forget নারীর সম্বন্ধে কোনদিনই চলে না। They (women) feel, though they may not

say or even think it, that slight or injury admits of no atonement.

একটা মেয়েলী ছড়া আছে—

ছোট সরাখানি ভেঙ্গে গেছে, বড় সরাখানি আছে;
হাসিমুখী বৌ, আমার হাতের আটকাল আছে।

ব্যাপারটা এই, একখানি ছোট সরার মাপে শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী বধূকে ভাত মেপে দিতেন; বলা বাহুল্য তা'তে বধূর পেট ভর্‌ত না। একদিন অসাবধানে শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী সরাখানি ভেঙ্গে ফেল্লেন; তা দেখে বধূর মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল—যে হয়ত বা এইবার "মা" বড় সরাখানির মাপে ভাত দেবেন। বধূর মুখের হাসি দেখে "মা" বল্লেন—হাস্‌চ কি বউ, মনে করচ যে, ছোট সরা ভেঙ্গে গেছে বলে' আমি বড় সরার মাপে তোমায় ভাত দেব— জেন, আমার হাতের আটকাল (অর্থাৎ আন্দাজ) আছে।

"মা"র এই ব্যবহার বা অনুরূপ ব্যবহার 'মেয়ে" অর্থাৎ বধূ কি ভুলতে পারে? কেন ভুলবে? সুতরাং শ্বাশুড়ী যখন dowagerত্ব প্রাপ্ত হ'ন, এবং বধূ সাম্রাজ্ঞী হ'য়ে বসেন তখন, "গাড়ি পর লা" হ'য়ে যায়। তখন যদি বধূ সুদ-সমেত শ্বাশুড়ীর প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে থাকেন ত আর্ত্তনাদ করলে চলবে কেন? One who sows the wind must reap the whirlwind—এ ত পড়েই রয়েচে। এই রকম চল্ল পরের পর; নারী যতদিন নারী থাকবে, দাসী হ'য়ে ঢুকবে আর ফাল হ'য়ে, অর্থাৎ শ্বাশুড়ী হ'য়ে, বেরুবে —ad nauseam .

সংসারের ভিতর বধূ পুত্রের স্নেহে ভাগ বসায় বলে' শ্বাশুড়ী জ্বলে মরেন। কর্ত্তার স্নেহে যদি কেহ ভাগ বসায় তা হ'লেও তাই হয়। কিন্তু কর্ত্তার স্নেহে যে ভাগ বসাতে পারে, সে কে? সেও নারী, কুলস্ত্রীই হ'ক আর কুলটাই হ'ক। তা'তেও তিনি জ্বলে মরেন, সংসারে অশান্তি বিশৃঙ্খলা আসে,—কিন্তু বধূটীর মত, সে জ্বালা মেটাবার পাত্র হাতের কাছে থাকে না, সুতরাং জ্বালা দ্বিগুণ হ'য়ে ওঠে। একজন রমণীই বলেচেন—I must accept here as in all relations between the sexes, the validity of the man's plea that rings—yea, and will continue to ring—through the centuries: "The woman tempted me."

অতএব যে দিক দিয়েই হোক, বধূর শত্রু শ্বাশুড়ী, শ্বাশুড়ীর শত্রু বধূ বা অপর নারী। পারী সহরের প্রসিদ্ধ একজন Police Commissioner কোন দুষ্কর্ম্মের Report তাঁর হুকুমের তলে আসলে, নীল পেন্সিলে প্রথম হুকুম দিতেন—Cherchez la femme, এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই না হোক অধিকাংশ স্থানেই, অনুসন্ধানের ফলে বা'র হ'ত যে, কোন নারী ঘটিত গোলমাল নিয়েই দুষ্কর্ম্মটী সংঘটিত হয়েছে। এ স্থলেও তাই। সংসারের মধ্যে নারীর দুঃখের নিদান খুঁজে বা'র করতে হ'লে—Cherchez la femme, দেখবে নারীই নারীর পরম শত্রু, পরম দুঃখের কারণ, নিশিদিন নির্য্যাতনের যন্ত্র স্বরূপ বিদ্যমান।

বাঙ্গালাদেশে নারীর অবস্থা আলোচনা করবার সময় অনেকে

রঘুনন্দনকে দোষ দিয়েছেন, শিক্ষার অভাবের কথা বলেছেন। ও-সব একেবারেই অসঙ্গত কথা। যে দেশে রঘুনন্দন নেই এবং শিক্ষা আছে, সেখানেও নারীর সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ মোটের উপর একই। Cattiness স্ত্রী-সুলভ গুণ বা দোষ। All women are cats—এটা ইংরাজী কথা! একজন বিদুষী ফরাসী রমণী আমাকে বলে-ছিলেন—Monsieur, nous sommes des chiennes. ইংলণ্ড বা ফ্রান্সে শিক্ষার অভাব নেই, আর সে দেশে রঘুনন্দনও নেই। কেউ হয়ত বলবেন, সেখানে তেমনতর শিক্ষা হয় নি, যে-শিক্ষায় নারীর প্রকৃতি বদ্‌লে যায়। সে শিক্ষা China থেকে Peru পর্য্যন্ত আজও কোথাও হয় নি বটে; সুতরাং হবারও যে বড় ভরসা আছে তা নেই। আর "দেবী"দের এত শিক্ষার অপেক্ষাই বা কেন?

তবে পুরুষ যে কবুল দিয়ে বসেছে সেটার কারণ কি? আমি একজন ইংরাজ মহিলারই কথায় তা'র উত্তর দিয়ে এই নারী-মঙ্গল শেষ করব—

Men's chivalry as well as their pride has woven a cloak of silence around this question; this silence has protected women—even the worst.

কন্যার কথা বেশী করে' বলবার আর সুযোগ হ'ল না; কন্যার পাত্র যোগাড়ের (যাতে সে পাত্র মহাশয়ের কিছুই প্রায় বলবার থাকে না, কেন না, বিবাহ ব্যাপারে তাঁকে পিতামাতার, বিশেষতঃ মাতা ঠাকুরাণীরই, নেওটো হ'তে হয়—তা পূর্ব্বেই বলিচি) কষ্ট

কল্পনা করে', আর ফুলসজ্জার তত্ত্বটা লাথি খেয়ে ফেরত আসবার সম্ভাবনাটা কল্পনা করে' গোড়া থেকেই ছেলে-মেয়ে তফাত হ'য়ে যায়। সেটাও যাঁর জন্য, মেয়েটা তা ভোলে না,—তা'র মা'র চোখের জল, আর বাপের শুষ্ক মুখ মনে গাঁথা থাকে। আর বধূ হ'লেও সে যখন মানুষ, তখন সে'ও ওত পেতে বসে' থাকে। সেই লাথি ফিরিয়ে দেবার সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতে ভোলে না।

২৫
প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ

কথায় বলে প্রেমে পড়া, falling in love ; পড়াই বটে, উঠা নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য দুটা বিভিন্ন জাতির কথার ভঙ্গীতে একই সত্য ফুটে উঠেচে,—যতক্ষণ বা যতদিন, প্রেমটা স্ত্রী ও পুরুষকে ছাপিয়ে, উপ্‌চে গিয়ে, সংসার, পরে সমাজ, শেষে জাতিটাকে অভিসিঞ্চিত করতে না পারচে, ততদিন সেটা পড়াই বলতে হবে, উঠা কিছুতেই বলা যাবে না।

একবার এক পুরুত ঠাকুর একটা বিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। বিয়ের মন্ত্রগুলা তাঁর মোটেই জানা ছিল না (এমন ত হ'য়ে থাকে!); তিনি ফুল বিল্বপত্র ঘণ্টা শাঁক ইত্যাদি নাড়ানাড়ির সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড় করে' অনুস্বার-বিসর্গ-ঘটিত কতকগুলা শব্দ উচ্চারণ করার পর, বর-ক'নের হাত দুটা এক করে' মালাগাছটা তা'তে জড়িয়ে বেঁধে দিয়ে বল্লেন—

যেমন বর তার তেমনি কন্যে,
এই আবাগী ছিল এই আবাগের জন্যে।

—বিয়ে হ'য়ে গেল।

পুরুত ঠাকুরের মন্ত্রটা খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় না হ'লেও, বর্ণে বর্ণে

সত্য। মোটের মাথায় সকল বিয়েতেই যেমন বর তা'র তেমনি কন্তে, যেমন 'দেবা' তেমনি 'দেবী'ই হ'য়ে থাকে; বিশেষ বিশেষ স্থলে যেখানে হয় না, বা হয় নি বলে' উভয় পক্ষের কা'রও সন্দেহ হয়, সেইখানেই গোল বাধে। কিন্তু যতদিন উভয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সুধু উভয়ের জন্যই জীবন ধারণ করে' থাকে, ততদিন তাদের মিলনটা 'আবাগে' আর 'আবাগী'র মিলন ছাড়া আর কিছুই হয় না; জন্তু জানোয়ারের মিলন তা'র চেয়ে কিছুতেই অন্যবিধ নয়।

বিয়েটাকে যে হিন্দু-শাস্ত্রে জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন বলেচে, তা'র নিগূঢ় অর্থ থেকে, সুধু বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে গোঁড়ামির একটা খুব কায়মি যুক্তি ছাড়া, আর কিছু পাওয়া যায় না তা' নয়। আমি বুঝি—আমার পূর্ব্বজন্ম আমার পিতৃপুরুষগণ, আর আমার পরজন্ম আমার ঔরসজাত সন্তান থেকে আরম্ভ করে' আমার ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ। এ-ছাড়া পূর্ব্বজন্ম আর পরজন্মের আমি কোন মানেই খুঁজে পাই না। আমার পূর্ব্বজন্মের অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণের চেহারা ও চরিত্র নিয়ে আমি জন্মেচি, তাঁদের শক্তি এবং দুর্ব্বলতার সমষ্টি potentialরূপে, সম্ভাবনা-রূপে আমার ভিতর রয়েছে; সে সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে, এবং আমি যে নব নব পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে চলেছি, তা'র সাহায্যে বা তা'র ধাক্কায়, আমার চেহারা আর চরিত্রের যথাযথ পরিবর্ত্তন হ'য়ে, আমারই পূর্ব্বজন্মের চেহারা আর চরিত্রের বনিয়াদের উপর, দৃশ্যত এবং বস্তুত একটা নূতন জীব তৈরী হ'য়ে, এই জীবন-নাট্যমঞ্চে অভিনয় করে' চলে যাব। আমি যদি সন্তানোৎপত্তি না করে' জীবনটা শেষ করে' যাই, তা হ'লে

আমার আর পরজন্ম বলে' কিছু হ'ল না, আর সেইখানেই আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের অথবা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ও সাধনার শেষ হ'য়ে গেল। প্রকৃতি স্বয়ং অনেক সময় undesirable বংশের বিলোপ সাধন করেন; অপদার্থ লম্বোদর ঘি-দুধের যমগুলার যে বংশলোপ হয়, বা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোকের যে বংশ থাকে না, সেটা এই-রকম একটা racial sanitation বজায় রাখবার জন্যই হ'য়ে থাকে। আমার মতন আফিংখোরের যে বংশ থাকবে না, এবং থাকা উচিৎ নয়, তা' জেনেই আমি প্রকৃতির কাজ এগিয়ে রাখবার জন্যই দার-পরিগ্রহ করি নি, না হ'লে এ কন্যাদায়গ্রস্ত দেশে আমারও 'দেবী' মিলত না কি?

মহীরুহের সম্ভাবনা নিয়েই ক্ষুদ্র বীজের জন্ম; সেই বীজের অভ্যন্তরে কত বসন্তের মলয়হিল্লোল, কত প্রভঞ্জনের প্রলয়-হুঙ্কার, কত বর্ষার সরসতা, কত নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপ, কত রবির কিরণ, চাঁদের জ্যোৎস্না, আকাশভরা অন্ধকার, আর অগণিত নক্ষত্রের দীপালোক—এ সবের নিদর্শন রুদ্ধ হ'য়ে রয়েচে, তা কেউ জানতে পারে? সেই ক্ষুদ্র বীজ থেকে যে মহীরুহের উদ্ভব, হবে, তা'রই সম্ভাবনা নিয়ে তা'র জন্ম—মলয়ানিলের সঙ্গে লাস্যবিলাস, প্রলয়ঙ্করী ঝটিকার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ, নিদাঘের অগ্নিমধ্যে নিদিধ্যাসন, বর্ষার বারিধারায় ঝারা স্নান, দিনের আলো ও রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে নিগূঢ় প্রেমালাপের সম্ভাবনা নিয়ে তা'র জন্ম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অজ্ঞাতে তিলে তিলে তা'র বৃদ্ধি পুষ্টি ও পরিণতি—অথবা মধ্যপথে কুঠারের ক্রূর আঘাতে কিম্বা কুলিষপাতে তা'র অকাল মৃত্যু ও

বৃক্ষজন্মের শেষ। এই রকম মানুষও সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়, সে সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হবে কি না তা'র স্থিরতা না থাক্লেও, একটা নির্দ্দিষ্ট পথেই সে যাবে, আর সে নির্দ্দিষ্ট পথটা তা'র অতীত ও বর্ত্তমান, তা'র পূর্ব্বজন্ম আর ইহজন্ম দুইয়ে মিলে, ঠিক করে' দেবে।

এ কথা যদি মান্তে হয়, তা হ'লে কখন্ কোন্ ভ্রমর এল কোন্ অজানা ফুলের পরাগ নিয়ে, কোন্ ফুলে ফল-সম্ভাবনা করে' গেল, সেই সংযোগটাকে সর্ব্বস্ব বলে' না মেনে, ফুলের পশ্চাতে বৃক্ষ, তা'র পশ্চাতে সহস্র বর্ষের দেওয়া-নেওয়া ভাঙ্গা-গড়াকে মানতে হয়, ফুলের পূর্ব্বজন্ম মান্তে হয়, আর ফুলের ভিতর ফলের, তার পর বৃক্ষের সম্ভাবনা অর্থাৎ পরজন্ম, সেটাকেও মানতে হয়; এবং সংযোগটাকে সুধু সংযোগ মাত্রই ধরে' নিলে, কোন ক্ষতিই হয় না। মনুষ্য জীবনে অতীতের সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত প্রচেষ্টার মর্য্যাদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহজন্মে তা'র সংস্কার, তা'র বিস্তার হয়, আর ভবিষ্য বংশীয়দের শোণিত-স্রোতে সঞ্চারিত হ'য়ে, চিরবহমান হ'য়ে, চলে যেতে পারে, তা'র জন্য যত্ন, তা'র জন্য এই জীবনে সমস্ত আয়োজন, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, ভোগ এবং যোগ সমস্তই করে' যেতে পারলে, তবে ত মনুষ্য জন্ম সার্থক হ'ল; নয়ত অভাগা আর অভাগীর মিলনকে অগ্নিসাক্ষী করে', নারায়ণকে ডেকে, সংস্কৃত-মন্ত্রপুত করে' কি লাভ? সেটা সুধু mummery and gibberish ছাড়া আর কিছু নয়!

অর্ব্বাচীনগুলো বিয়েটাকে একটা mummeryই করে' তুলেচে, একটা অভিনয়ে এনে দাঁড় করিয়েচে। ক'নে যাচাই করা থেকে

সুরু করে', ক'নেকে ঘরে পোরা পর্য্যন্ত (দেনাপাওনার পালাটা বাদ দিয়ে) একটা অভিনয় বই আর কি ? ছোট দিদিমণির স্নেহাশীষ. আর ছোঠ্‌ঠাকুমা-মণির কাষ্ঠ-রসিকতা, আর বন্ধুমণিদের জ্যাঠামি-পূর্ণ বিয়ের Hand-billগুলো থেকে অভিনয় ছাড়া আর কি মনে হয় ?

তবে কি মনোনয়নের কোন মানে নেই ? প্রেমের মিলন বলে যাকে, সেটা কি আকাশ-কুসুম বা অশ্বডিম্ব ? মনোনয়নের এক-একটা ধারা সব দেশেই আছে ; তার রহস্য আর একদিন ভেদ করবার চেষ্টা করা যাবে ; তবে মোটের উপর এই কথাটা আজই বলে রাখি যে, চিনিতে ছানাতে মিশিয়ে খোলায় চড়িয়ে তাড়ু দিয়ে নাড়লে দুইএ মিশে ভীমনাগের মণ্ডা হয় ; আর চিনি চড়িয়ে রস পেকে এলে, তা'তে ছানা ছেড়ে দিয়ে তা'কে সেই তাড়ু দিয়ে নাড়লেও ভীম নাগের মণ্ডা হয়। উভয়ত্র তাড়ু-নাড়াটাই Common factor আর সেটা খুব Essential factor. এই জীবনে স্ত্রীপুরুষের মিলনের মধ্যেও—এই জীবন-মরণের অগ্নিকুণ্ডের উপর অবস্থিত সংসার কটাহে, সুখ-দুঃখের আলোড়ন-বিলোড়নের মধ্যে, দু'টী হৃদয় যে গলে' গিয়ে, মিশে গিয়ে, এক হ'য়ে যায় তা'র নাম—প্রেম। যুবক-যুবতীর হৃদয় যে টগ্‌বগ্‌ করে' ফুটতে ফুটতে, একটা আর-একটার দিকে ছুটে গিয়ে শান্ত হ'তে চায়, সেটার নাম দেহের, স্নায়ুর উত্তেজনা, তা'র নাম কাম,—সেটা "বরষিল মেঘ" ত "ধরণী ভেল শীতল" সেটার কথা না বলাই ভাল। মোটের মাথায় সেটা স্বার্থপরতা, Egotismএর চূড়ান্ত Egotism ; এই Egotism, এই টগ্‌বগে

প্রেমকে বাদ দেওয়াও যায় না, তবে তাকেই বিবাহের চূড়ান্ত সার্থকতা করেচ কি অমনি সহস্র জীবনের গতিটা, Idealটা পাল্‌টে গেছে; তা'হলেই নিক্তির ওজনে দাম্পত্যের দাবী-দাওয়ার বিভাগ করবার আবদার আসবে, কে বড় কে ছোট, "বর বড় কি ক'নে বড়" তা'র মাপকাটী খুঁজতে ছুটে বেরিয়ে পড়তে হবে, স্বামীর কাছে আত্মোৎসর্গের নাম হবে দাসীত্ব, ছেলে মানুষকরার নাম হবে নারীত্বের অপচয়, আর যার জোরে এত লম্ফঝম্ফ অর্থাৎ "যৌবন জলতরঙ্গ"—ততক্ষণে তা'তে ভাটা পড়ে আসবে।

আমাদের দেশে আমাদের সমাজে এই টগ্‌বগানিকে প্রশ্রয় দেবার ব্যবস্থা নেই,—হয় ভালই, না হয় কুছ পরোয়া নেই। কারণ এই সংসার কটাহে সুখদুঃখের তাড়নার মধ্যে দুইএ মিশে এক হবেই হবে, তবে একেবারে ভীমনাগের মণ্ডা যদি না হয় ত কুছ পরোয়া নেই। কারণ এই মিশে যাওয়াটাই চূড়ান্ত ব্যাপার নয়; এই মিলনের যে ফল, সন্তানসন্ততি, সেই সন্তানের পালন, তা'র শিক্ষা, তা'র গঠন, এক কথায় সমস্ত বংশগত উৎকর্ষের উত্তরাধিকারী করে' তা'কে সমাজে ও দেশে ছেড়ে দেওয়া, তা'রই জন্যে জীবনের সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করতে হ'বে; আপনার জীবনে যেটা সিদ্ধ হ'ল না, অথচ হওয়া উচিত ছিল, পরজন্মে অর্থাৎ ছেলে-মেয়ের জীবনে যাতে সেটার পূরণ হ'তে পারে তার ব্যবস্থা করতে হ'বে; এইখানেই স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সার্থকতার প্রথম স্তর, আর এইখানে Egotism আর টগ্‌বগানির অবসান।

তারপর সমাজ ও জাতি; মা বাপের ঋণ বলে' যদি কিছু থাকে

তা'র চেয়ে বড় ঋণ সমাজের কাছে, দেশের কাছে। সে ঋণ, চক্রবৃদ্ধি হিসাবে, পুরুষানুক্রমে বেড়েই যায়, কমে না; যত পার তুমি পরিশোধ কর, তারপর পরজন্মে, অর্থাৎ তুমিই তোমার পুত্ররূপে পরিশোধ করবে। যুগে যুগে নব নব ঋণভার অর্থাৎ কর্ত্তব্যের ভার এসে পড়বে, তা' পালন করবার উপযোগী তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক, সুবিমল চরিত্র, সুপ্রশস্ত বুকের ছাতি—এসব প্রস্তুত করে' দিয়ে তোমায় যেতে হবে; আপনাকে ছাড়িয়ে সংসার, সংসার ছাড়িয়ে সমাজ, সমাজ ছাড়িয়ে দেশকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করে' দিতে হবে—সে প্রেমের উৎস হবে তুমি ও তোমার নারী—দুই এ মিলে অর্দ্ধনারীশ্বর; তবে ত বিবাহ বল, প্রেম বল সার্থক হবে, নয়ত "দেবা" "দেবী"র পিরীতি ত কুক্কুর কুক্কুরীর সম্মিলন মাত্র।

যারা ঠেকে শিখ্‌চে (আমরাও অনেক ঠেকে শিখেছিলুম এখন ভুল্‌তে বসেচি) তাদেরই একজন বিদুষীর লেখনি নিঃসৃত বাণী উদ্ধৃত করে' আমার পত্র শেষ করি; Englandএর বদলে India এই পাঠান্তর গ্রহণ করলে অর্থের কোন উনিশ-বিশ হবে না—Let the young women of England learn as a new great faith that the sons and daughters they bear are not their children and the children of their husbands only, but the sons and daughters of England—the inheritors of all the fine tradition of our race. Let us spread the new romance of Love's responsibility to Life; let us honour ideals

of self-dedication to our husbands, understanding their dependence upon us, to our homes, to our sons and our daughters, to our race, its great ones and their deeds; our moral obligations to all children even before they are born.

২৬

মহাত্মার ভুল

একজন ইংরাজ লেখিকা বলেচেন --Truth-telling does not pay in the long run. তবে আমি লাভের খাতিরে সত্য কথা বলচি না এই যা, নইলে বাস্তবিকই সত্য কথা বলে' লাভ নেই এ কথা সত্য! এই রকমই দুনিয়া, কি করা যাবে।

ঘটনা সত্য, আমার মৌতাতের মুখের কথা নয়, আজগুবী কল্পনা নয়, সত্য ঘটনা।

আমার দাওয়ায় বসে' আছি, একখানা কয়লা বোঝাই গরুর গাড়ি আমার কুঁড়ের সুমুখের রাস্তা দিয়ে মন্থর গমনে চলে' যাচ্ছে—একজন গরুর ল্যাজ মলচে, আর একজন কয়লার বস্তার উপর বসে' চীৎকার করে' বলচে—"লে—কোইলা"; দুইজনেই বেহারী হিন্দুস্থানী। আমার কুঁড়ের সম্মুখের বাড়ী থেকে কে জিজ্ঞাসা করলে—"কত করে' কয়লা?" গাড়ির উপরকার লোকটা বল্লে—"ন' আনা মণ"।

প্রশ্ন। কয়লা ওজন করে' দিবি?

উত্তর। তা হ'লে বার আনা—

প্রশ্ন। তবে ন' আনা মণ বলচিস্?

উত্তর। তা' জানে না, লিবে ত লাও, হামি অত জানে না।

প্রশ্নকারী। আচ্ছা, বার আনাই দেব, দিয়ে যা।

গাড়োয়ানটা কয়লার বস্তা পিঠে করে' খদ্দেরের বাড়ির ভেতর গেল; দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার দাওয়ার সন্নিকটে এসে আমায় প্রশ্ন কল্লে—বাবু আখ্‌বার পড়চ; কি খবর লিখেসে?

আমি একখানা ইংরাজি সংবাদপত্র পড়ছিলুম, বল্লুম—"খবর অনেক, বসে' শোন ত বলি, এক কথায় কি বল্‌ব?"

সে। মহাত্মাজীর কিছু খবর লিখেসে?

আমি। না—

সে। ইংরাজের আখ্‌বারে লিখবে না!

আমি। লেখে, তবে আজকের কাগজে তাঁর সম্বন্ধে কিছু সংবাদ নেই।

সে। বাবু, মহাত্মাজী তো স্বরাজ লে লেগা!

ঠিক সেই সময়ে কয়লা ঢেলে দিয়ে গাড়োয়ানটা এসে যোগ দিয়ে বল্লে—"হাঁ বাবু, গান্ধীজী জরুর স্বরাজ লেগা।"

আমি। কি করে' লেগা?

দুইজনে। চর্‌খাসে, বাবু, চর্‌খাসে!

আমি। চরকায় ত সুতা কাটা হয়, স্বরাজ কি করে' হবে বল দেখি!

গাড়োয়ান। বো চরখাকা চক্র যো হায়, সো সুদর্শন চক্র হো যায় গা; ঔর, উস্‌কী ডোরী ঔর সুই যো হায়, সো ধনুর্ব্বাণ হো যায় গা!

আমি। তা' সে সুদর্শন কে ঘোরাবে? আর ধনুর্ব্বাণই বা ছুড়বে কে?

গা। গান্ধীজী আপ্‌নে, ঔর কোন?

আমি। আর তুমি ঠিক এই রকম আধ-মণ কয়লার বস্তাকে এক-মণ করে' বেচতে থাকবে ত?

গা। ক্যা করেগা, বাবুজী; গরীব আদমী, খায়গা ক্যায়সে?

"লে—কোইলা" বলে' গাড়ীর উপর গিয়ে লোকটা বসল, আর গাড়োয়ানটা গরুর ল্যাজ নির্ম্মম ভাবে পীড়ন করায় গরু দু'টা দ্রুত পদক্ষেপে চলতে লাগল।

বলিহারী ভারতবর্ষের মাটিকে! এখানে গুরু আর চেলা, অবতার আর তল্পীদার ছাড়া আর কিছু জন্মাল না। যিনিই সাধারণ মানুষের চেয়ে একধাপ উপরে উঠলেন, তিনিই হলেন অবতার, আর মুমুক্ষু মানুষগুলো সব-কাজ তাঁরই উপর ন্যস্ত করে' নিশ্চিন্ত হ'ল। হায়রে অবতার, পরের বোঝা বহন করবার এমন মিনি-পয়সার মুটে আর কোন রাজ্যে জন্মায় না!

আহা! জগৎটা যদি সেই রকমই হ'ত! মাষ্টার পড়া মুখস্থ কল্লে যদি ভক্তিমান ছেলে পাশ হ'ত; ডাক্তার নিজের prescribed ঔষধ সেবন কল্লে যদি ভিজিট দিয়েচে বলে' রোগী আরাম হ'ত; জজ সাহেব বিচার শেষ করে' জেলে প্রবেশ করলে তাঁ'র জয়গান করায়, যদি অপরাধীর প্রায়শ্চিত্ত হ'ত; আর-একজন আফিং খেলে দরিদ্র কমলাকান্তের যদি, সুধু দোহাই দিয়েই, হাইতোলা নিবারণ

হ'ত, তা হ'লে কি মজাই হ'ত! কি সুখের রাজত্বই হ'ত! কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভগবান তা'র উল্টা ব্যবস্থাই করে' রেখেচেন; "যার বিষপাত্র আনি' দেয় তা'র মুখে" এই নির্ম্মম নিয়মেই জগৎটা চলচে। যিনি যে ফলার মেখেচেন তাঁকেই সেটা তুলতে হবে, "বরাতি" কাজ মোটেই চলবে না। আর পরকালেই যদি সব হিসাবের নিকাশ হ'ত, তা হ'লেও কোন গোল হ'ত না; তা হ'লে

সঙ্কীর্ণ এ ভবকুলে দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে
করিতাম অবহেলা পরলোকে!

কেন না কেই বা পরলোকের খোঁজ রাখচে। কিন্তু ব্যাপার তা নয়, এইখানেই সব কাজের বোঝাপড়া হ'য়ে থাকে; ব্যক্তির বল, জাতির বল, বোঝাপড়া এই এক পুরুষে, না হয়, দু' পুরুষে, না হয় তিন পুরুষে,—নয়ত পুরুষ-পরম্পরায় যুগ-যুগান্তর ধরে' তা'র প্রায়শ্চিত্ত চল্‌তে থাকে। '৫৭ সালের বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত ত জগৎ শেঠ থেকে আরম্ভ করে' চুনোপুঁটী সকলেই করে' গেছে, আর বাংলার লোক—জনসাধারণ, ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে বসে' ছিল বলে', আজও সেই Criminal indifferenceএর প্রায়শ্চিত্ত করচে—যে বিষের পাত্র অপরিণামদর্শী যুবার মুখে ধরে' ছিল, সেই বিষপাত্র আজও জনে জনে পান করচে।

কিন্তু কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েচি! কয়লাওয়ালার কথা থেকে একেবারে পলাশীতে গিয়ে পড়েচি।

গান্ধীজীর ভুল হ'য়েচে বল্লে হয়ত দেশসুদ্ধ লোক আমার উপর

খড়্গ হস্ত হ'য়ে উঠবে, আমার তা'তে বিশেষ এসে যাবে না। আমি বলতে বাধ্য—গান্ধীজীর ভুলই হয়েচে, এবং খুব বড় রকমেরই ভুল হয়েচে। তিনি মানুষ চিনতে পারেন নি; "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"—তাঁর হীরার ধার এই মেষপালের শিংএর স্পর্শে ভেঙ্গে গেছে। তিনি নিশ্চয়ই এখন তা বুঝতে পাচ্চেন; তাঁর শিষ্যবর্গ সে কথা স্বীকার করায় গুরুর অমর্য্যাদা করা হবে ভাবলেও, আমি বলব তাঁর মত বিচক্ষণ পুরুষ নিশ্চয়ই নিজের ভুলটা বুঝতে পাচ্চেন; তিনি যে ভেড়ার পালকে পক্ষীরাজ ঘোড়া মনে করেছিলেন—এইটে তাঁর প্রথম ভুল।

তাঁর দ্বিতীয় ভুল এই, ভারতবর্ষকে যিনি উদ্ধার করবেন, তাঁকে ভারতবাসীর হ'য়ে সব কাজ করে' দিতে হবে—একথা তাঁর স্মৃতিপথ থেকে চলে' গিয়েছিল। তাঁকে যে দেশসুদ্ধ লোক, বিশেষ করে' তাঁর যাদের উপর বেশী নির্ভর, অর্থাৎ শিক্ষিত বলতে যারা তা ছাড়া ভারতের আর সকলে, তা'রা যে তাঁকে দেবতা বানিয়ে দিয়েছে, তা'র কি কোন গূঢ় অভিপ্রায় নেই? এক জনকে দেবতা বানালে তা'র উপর সবটা ছেড়ে দিলে, কাজ কত সহজ হ'য়ে আসে মহাত্মাজীর চেলারা কি বোঝে নি? চেলাগণ নির্ব্বিবাদে আপনাপন ধান্দা নিয়ে থাকবে—যে ব্যবসাদার সে খদ্দেরকে পেঁচিয়ে কাটতে থাকবে, যে জমিদার সে প্রজাকে জবাই করতে থাকবে, যে সুদখোর সে চক্রবৃদ্ধির চক্রে ফেলে অধমর্ণকে চরকির পাকে ঘোরাতে থাকবে, আর মহাত্মাজী শ্রীকৃষ্ণরূপে সুদর্শনচক্র ঘুরিয়ে অরাতি-নিধন করবেন, শ্রীরামচন্দ্ররূপে ধনুর্ব্বাণ হাতে যজ্ঞ-

বিঘ্নকারীদের জব্দ করবেন, এবম্বিধ division of labourএ কাজের কেমন সুবিধা মহাত্মাজীর চেলারা কি বোঝেনি? কারও গায়ে আঁচটি লাগবে না, অথচ কার্য্য ফতে হ'য়ে যাবে—এ ব্যবস্থা যে কত সুবিধাজনক তারা কি তা' বোঝেনি?

মহাত্মাজীর অভিপ্রায় নিশ্চয়ই তা' নয়; কিন্তু স্পষ্ট করে' তাঁর অভিপ্রায় যে তা নয়, তিনি স্বয়ং বুঝিয়ে দিলেও, আমার বিশ্বাস চেলারা তা' বুঝবে না; তা'রা বল্‌বে,—"প্রভু ছলনা করচেন, ভক্তদের পরীক্ষা করচেন, তিনিই করবেন সব, তবে হঠাৎ কি মহাপুরুষরা ধরা দিতে চান!" কিন্তু যে দিন বাধ্য হ'য়ে বুঝবে যে চরকার চাকা সুদর্শন-চক্র হবে না, সেদিন মহাত্মাজীর প্রতি যে-ভক্তি সুদর্শন-চক্রের সম্ভাবনাটা সৃজন করেচে সে-ভক্তির অবস্থা যে কি হ'বে, তা আমি ঠিক বল্‌তে পারচি না। সেটা একটা নিদারুণ tragedyই হবে বলে' আমার মনে হয়।

ভারতবাসীর ভুতুড়ে ভাবটাকে যথেষ্ট রকম recognise না করাই মহাত্মাজীর একটা দারুণ ভুল হ'য়েচে; মানুষকে হঠাৎ দেবতা বানিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার ভাবটা যে মজ্জাগত ভারতীয় ভাব, সে বিষয়ে যথেষ্ট precaution না নেওয়াই হয়েচে ভুল। চেলাদের পক্ষে তাঁর ঋষিতুল্য মনুষ্য-চরিত্রে দেব-চরিত্রের আরোপ করে' তাঁকে খুব বড় করে' দেওয়া যত সহজে হ'য়েছে, তাঁর পক্ষে চরকার চাকা সুদর্শন-চক্রে পরিণত করা কিছুতেই তত সহজে হবে না। সুধু বিহারী কয়লাওয়ালা যে এই ভুলটা আঁকড়ে ধরে' আছে তা নয়, অজ্ঞ জনসাধারণ—যারা বাস্তবিকই ভারতের ভরসাস্থল—

তাদের অধিকাংশেরই এই ধারণা। এ ধারণা পত্রপাঠ দূর করতে হ'বে—তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে

When ye kneel to God in penitence
And cringe no more to men
Ye shall smite the stiff-necked infidel
And rule—but not till then!

এই বাণী যিনি বলবার মত করে' বলতে পারবেন, এবং ভারতবাসীকে শোনবার মত করে' শুনতে বাধ্য করতে পারবেন, তিনিই সিন্ধুবাদের ঘাড়ের ভূতটাকে নামাতে পারবেন, তিনি গান্ধীজীর চেয়েও বড়!

২৭

প্রসন্ন গোয়ালিনীর আধ্যাত্মিকতা

প্রসন্ন দুধে জল দেয়, আর খাঁটি দুধ বলে' বিক্রী করে ; জিজ্ঞাসা করলে গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেয় ; আবার বার মাসে তের পার্ব্বণ করে, ষষ্ঠী থেকে ওলাবিবি পর্য্যন্ত কেউ বাদ যায় না ; বারব্রত করে, তা'র উপর দরিদ্র ব্রাহ্মণের সেবাও করে, মুষ্টিভিক্ষাও দেয়। এখন প্রসন্নকে materialismগ্রস্ত বলব, না spiritual বলব, এই হচ্চে প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারলে, একটা বড় রকম প্রশ্নের মীমাংসা হ'য়ে যাবে, সেটা হচ্চে এই—ইউরোপ বলতেই material, আর এসিয়া তথা ভারতবর্ষ বলতেই spiritual একথাটা সত্য কি না, বা কতখানি সত্য তা'র মীমাংসা হ'য়ে যাবে।

কেউ কেউ বলতে পারেন, প্রসন্ন কি একটা type, প্রসন্ন কি Asiatic তথা ভারতবর্ষীয় চরিত্রের epitome, যে প্রসন্ন-চরিত্র আলোচনা করে' কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে, সমগ্র Asia বা ভারতবর্ষে খাটবে ? প্রথমে ত সন্দেহ উঠতেই পারে যে প্রসন্ন মেয়ে-মানুষ, অতএব তা'র চরিত্র আধখানা Asia বা আধখানা ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলতে পারে, আর আধখানার সঙ্গে মিলবে না, একথা ত ধরেই নেওয়া চলে।

তোমরা প্রসন্নকে চেননা, তাই এই অর্ব্বাচীনের আপত্তি তুলচ। আমি প্রসন্নকে জানি, চিনি—আমি বলছি, প্রসন্ন পুরুষও বটে নারীও বটে। সে যখন তা'র পাওনা-গণ্ডা আদায় করে, তখন সে কাবুলীওয়ালারও কান কেটে দেয়; মঙ্গলা যখন গোঁজ উপড়ে চোঁচা দৌড় দেয়, তখন তা'র দড়ি গাছটা ধরে' যখন সে তা'কে stand still করে, তখন রামমূর্ত্তির মোটর-গাড়ী ধরা মনে পড়ে; সে পঞ্চাশটা খদ্দেরের দুধের হিসাব, যখন মুখে মুখে করে' দিয়ে balance sheet মিলিয়ে দেয়, তখন তা'কে কৃষ্ণলাল দত্তের পাশে স্থান না দিয়ে থাকা যায় না; আর পাড়ায় শ্বাশুড়ী-বৌএর ঝগড়ার বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে, যখন সে পরস্পরের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের বিশ্লেষণ করে', দোষ-গুণের ওজন করে', কোন অদৃশ্য জুরীর সমক্ষে charge দিতে থাকে, তখন তা'কে দায়রার জজের আসনে বসাতে ইচ্ছে করে; তারপর, অন্দর-মহলে যখন মেয়েদের মিছিল বসে, সুনীতি দুর্নীতির বিচার হয়, মেয়ে-পুরুষের চরিত্রগত কত কূট তর্কের বিশ্লেষণ হয়, কতক কথায়, কতক ছড়ায়, কতক কবিতায়, কতক গানে, কতক ইঙ্গিতেইসারায়, বোসেদের ঘোষেদের কুণ্ডুদের পালেদের চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যেদের,—সমস্ত গ্রামটারই, পুরাবৃত্তের আলোচনা হয়, অতীত বর্ত্তমান কীর্ত্তি-অকীর্ত্তির গবেষণা হয়, তা'তে প্রসন্ন, গয়লা বৌ হ'লে কি হয়, সে democratic সভায়, তা'র কত জানা-অজানা তথ্যের সম্ভার নিয়ে যখন বসে, তখন সে যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ মহলের বিচার-সভার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তেও সক্ষম, তা'র ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়ে থাকে। তারপর সে যখন গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে গ্রামের

শিব মন্দিরের উঠানে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করে, তা'র তিন কুলে কেউ নেই, তবুও সে যে কার জন্যে মাথা খোঁড়ে তা বুঝে উঠতে না পারলেও, তা'র দেবতার প্রতি অগাধ ভক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই করতে পারা যায় না।

অতএব প্রসন্নকে, মেয়েমানুষ হ'লেও, type ধরে' নিলে ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না, এটা আমি বলতে পারি। তবে আমি ইংরাজি-শিক্ষিত লোকগুলোকে একেবারে বাদ দিচ্চি; তা'র প্রথম কারণ, তা'রা ইংরাজি জানে, প্রসন্ন ইংরাজি জানে না, সুতরাং প্রসন্ন তা'দের type বা প্রতীক হ'তে পারে না। দ্বিতীয় কথা, ইংরাজি শিক্ষিতগুলো, দুধে যেমন একটী ফোঁটা অম্ল বা গো-মূত্র পড়লে দুধ কেটে যায়, তা'রা তেমনি দু'পাতা ইংরাজি পড়ে' কেটে গেছে, জমে গেছে, বা ছিঁড়ে গেছে—যাই বল; সেগুলো না এদিক না ওদিক, বৈদিক হ'য়ে গেছে। তৃতীয় কথা, এই ইংরাজি শিক্ষিতগুলো যে সব-কথা তলিয়ে বোঝবার আস্ফালন করে, সেই আস্ফালনই spiritualityর পরম অন্তরায়। অতএব ইংরাজির অম্লরস থেকে spiritualityর ক্ষীর সমুদ্রকে রক্ষা করতে হ'লে, ইংরাজি নবীশগুলোকে বাদই দেওয়া উচিত বিধায় তাদের আমি বাদ দিলুম! কেউ যেন মনে না করেন, আমি স্বয়ং ইংরাজিতে অষ্টরম্ভা বলে' এই কার্য্য করলুম। তা নয়, যেহেতু আমি যথেষ্ট কারণ না দেখিয়ে বাদ দিই নি।

আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্ত্তি যদি পুরোহিত ঠাকুরকে ধরা যায় তা হ'লে কারও আপত্তি হবে কি? আমি সেই প্রতিমূর্ত্তির সঙ্গে প্রসন্নর তুলনা করে' দেখিয়ে দেব যে, দুইই হুবহু মেলে।

আধ্যাত্মিকতা বা spiritualityর প্রথম লক্ষণই হচ্চে—তলিয়ে বোঝবার স্পর্দ্ধা না রাখা; তাঁর তা' আছে—তিনি মন্ত্র বলেন তা'র মানে বোঝেন না, ভাষার অর্থ হয়ত কিছুকিছু বোঝেন, অর্থের তাৎপর্য্য মোটেই বোঝেন না। যদি কেউ বোঝবার জন্য, তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য নয়, তাঁকে প্রশ্ন করে, তা'তে তিনি অগ্নি-শর্ম্মা হ'য়ে ওঠেন,—এ সবই spiiitualityর লক্ষণ; আর এসবগুলিই প্রসন্নতে বর্ত্তমান—প্রসন্ন দুধে জল দেয়, খদ্দেরকে ঠকাবার মতলবে যে দেয় তা যেন কেউ মনে না করেন, গয়লা বংশের কৌলিক প্রথা তাই দেয়। সে বলে, যে দুধে জল দেয় না সে গয়লা নয়, অতএব তা'র জাতের মান রাখতে হ'লে তা'কে জল দিতেই হবে। কিন্তু "কেন জল দিয়েছ" এই নিতান্ত অবান্তর প্রশ্ন যদি কেউ করে, তা'র মুখের 'আব্বি' থাকে না। 'কেন'র উত্তর কেউ দেবে না—পুরুতও না, প্রসন্নও না। পূজা, বার ব্রত, দান ধ্যান এ সব বিষয়েই তা'র মনের অবস্থা একই—বোঝে না কিন্তু করে' যায়, অতএব সে spiritual! সমধর্ম্মী বলেই প্রসন্নর সঙ্গে এবং প্রসন্ন যাঁদের type তাঁদের সঙ্গে, পুরুত ঠাকুরের বনে ভাল; পুরুত ঠাকুরও পদ্মলোচন—প্রসন্নও পদ্মলোচন, দু'জনে জীবনের পথে হোঁচট খেতে খেতে চলেন ভাল। পুরুতঠাকুর এমন certificateও দেন যে, প্রসন্ন আছে বলে' ধর্ম্ম আছে; ধর্ম্মটা প্রসন্নরাই রেখেচে, না হ'লে, পুরুতঠাকুরের ব্যবসাও মাটি হ'ত, আর সেই সঙ্গে সমাজ, দেশ ইত্যাদি সব ছড়িয়ে পড়ত; এখনও যে ছড়িয়ে পড়ে নি সেটা Priest cum

Prasanna এই entente cordiale বর্ত্তমান আছে বলে'।

আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশের প্রাণ যে চাষী, তা'র চরিত্র দেখে বিচার করলে, প্রসন্ন ঠিক তা'রই মত spiritual প্রমাণ হ'য়ে যাবে। প্রথম সে সাহেব দেখলে পালায়; লোকে বলে ভয়ে, আমি জানি ম্লেচ্ছসংস্পর্শে তা'র spirituality নষ্ট হ'য়ে যাবে এইজন্য। প্রসন্নও, যে পথ দিয়ে সাহেব চলে' যায়, তিন দিন সে সে-পথে চলে না; লোকে বলে ভয়ে, আমি জানি তা'র ভয়ের বয়স গেছে, তথাপি পাছে ম্লেচ্ছসংস্পর্শে তা'র গয়লা-বংশ অপবিত্র হ'য়ে যায় এই আশঙ্কায়। চাষা ভায়া ধানচাল বেচেন pile করে,'—ডাল বেচেন ধুলা ও মাটি মিশিয়ে ভারি করে',—পাট বেচেন জলে ভিজিয়ে; প্রসন্ন দুধ বেচে জল মিশিয়ে, অতএব দুই তুল্য মূল্য। এবং উভয়েই যথাক্রমে গঙ্গাজল ছিটিয়ে গৃহের পবিত্রতা সম্পাদন করেন, এবং লক্ষ্মীপূজা করে', ষষ্ঠীপূজা করে', পুরুত ঠাকুরকে দক্ষিণা দিয়ে আত্মাকে disinfect করেন; অতএব প্রসন্ন আধ্যাত্মিকই প্রমাণ হ'য়ে যাচ্ছে।

দেশের ব্যবসাদার—মাড়োয়ারী থেকে আরম্ভ করে' চুনোপুটি জেলে-মালা পর্য্যন্ত—সবাই "ধম্ম" করেন, পূজা করেন, পাঠ করেন, রামায়ণ শুনেন, কীর্ত্তন করেন, গোমাতার জন্য পিঁজরাপোল করে' দেন, খট্‌মল্ পিলান,—আর ঘিয়ে সাপের চর্ব্বি মিশিয়ে মানুষ ভাইকে খেতে দেন, দরকার মত গণেশ উল্টান, ব্যবসা চলতি হ'য়ে গেলেই মালে খাট করেন, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, পরের টাকাকে খোলামকুচি জ্ঞান করে' তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন। কামার, কুমার, শেকরা,

ময়রা ভাই সকল বিশ্বকর্ম্মার পূজা করেন, হাতুড়ি ছেনি নিক্তি ইত্যাদিকে গড় করেন, আর চোখের আড়াল হ'লেই কাজে ফাঁকি মারেন, ওজনে কম দেন, ভেল্সা-ভ্যাজাল চালাতে পাল্লে আর বিশ্বকর্ম্মাকে মনে থাকে না। প্রসন্ন এ সবই যথারীতি করে' থাকে—কে জানে ডোবার জল, আর কে জানে পাতকোর জল, দুধের সঙ্গে মিশিয়ে কচি ছেলের বিষ তৈরী করে' বেচেন, নূতন খদ্দেরকে দু'দিন একটু রং রেখে দুধ দিয়েই নিজমূর্ত্তি ধারণ করেন, দুধও নিজমূর্ত্তি ধরে', মাপে মারেন, পারলে হিসেবেও মারেন। আর এই সব ব্যবসাদারীর হজ্‌মিগুলি হিসাবে পূজাপাঠ, বারব্রত এ সবই চলতে থাকে। অতএব প্রমাণ হ'য়ে গেল, প্রসন্ন typeও বটে, spiritual typeও বটে।

তারপর প্রসন্ন যাদের, constructive নয়, literal type, অর্থাৎ আমাদের দেশের নারীকুল, তাঁদের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে পুরুত ঠাকুর যে certificate দিয়েছেন তা'র উপর ত আর কথা নেই—তাঁরা আছেন বলে' ধর্ম্ম আছে, আর তা'র আনুসঙ্গিক যা কিছু আছে। তাঁরা হাঁচি টিকটিকি মানেন, বিষ্যুৎবারের বারবেলা মানেন, অশ্লেষা-মঘা মানেন তাই এত বড় জ্যোতিষ-শাস্ত্রটা বেঁচে আছে, ষষ্ঠি-মাকাল মানেন তাই তেত্রিশ কোটী দেবতার খোরাক জুটচে, উপরন্তু "এঁটো" আর "ন্যাড়া" নামে তেত্রিশ কোটির ওপর দুই জাগ্রত দেবতার প্রাদুর্ভাব হ'য়েচে। তাঁরা এখনও পুরাণ-পাঠ ছলে কথকতার ভাঁড়ামি শোনেন বলে' পুরাণাদি শাস্ত্র জীবিত আছে, তাঁরা তীর্থ করেন বলে' এখনও মোহান্ত ও পাণ্ডাদের পেট

মোটা হচ্চে, আর "নবীন-এলোকেশীর" পালার শেষ অভিনয় রজনী এখনও আসে নি; উপরন্তু ঝাড়ফুঁক, মাদুলি, রক্ষাকবচ ইত্যাদি বেদের ছাঁট, অথর্ব্ব বেদের debris এখনও লোকে ভুলতে পারে নি, মোটের উপর সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের কাঠামটা তাঁদের ঠেসেই দাঁড়িয়ে আছে, ঘুণ ধরলেও ভূমিসাৎ হয় নি। বিচার করবার একটু অক্ষমতা, অতিরঞ্জনের প্রতি একটু ঝোঁক, সত্যের প্রতি একটু কম টান, ছুটো পরচর্চ্চায় কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি, স্বজাতীয়ার প্রতি একটু ঈর্ষ্যা অসূয়া—এ সব সামান্য কথার জন্য আধ্যাত্মিকতার ব্যত্যয় হ'তে পারে কি? কেউ বলতে পারেন, প্রসন্ন কি একাই এই সব লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত? আমি বলি না তা নয়, প্রায় সব দেশের নারী-কুলই এই রকম। কিন্তু প্রসন্নর বিশেষত্ব এই যে, সে আধ্যাত্মিক, অন্য দেশের নারীর সে বড়াই নেই—এইটুকু তফাৎ।

এ পর্য্যন্ত ন্যায়শাস্ত্রের method of agreement দিয়ে প্রমাণ করলুম যে প্রসন্ন spiritual তন্ত্রের। এখন একবার method of difference দিয়ে differential diagnosis করে' দেখা যাক, তা'তেও যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারা যায়, তা হ'লেই প্রমাণটা অকাট্য হ'য়ে গেল।

প্রথম কথা ইউরোপীয়গণ খাদ্যের কোন বিচার করে না,—তা'রা গরু খায়, যদিও সেই সঙ্গে গরুর এমন ব্যবস্থা করে যে গরু দুধের সাগর হ'য়ে যায়, দিনে আধমণ পর্য্যন্ত দুধ দেয়। এ materialism আমাদের দেশে নেই,—আমরা গরু খাই না (ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র নাকি বলেছেন আমরা গরু খেতুম, তিনি

ইংরেজীনবীশ, তাঁর কথা আমি কানেই তুলতে প্রস্তুত নই), আমাদের গো-মাতাগণ আমাদের যত্নের চোটে "ছটাকে" হ'য়ে এসেচেন। কিন্তু তা'তে কি এসে যায়, আমরা গো-পার্ব্বণে তাঁদের গায়ে যথারীতি গেরীমাটির ছাপ দি ; ইউরোপীয়গণ তা করে না। এই ত গেল গো-চর্য্যার কথা, এখানে মৌলিক পার্থক্য—খাওয়া ও খাওয়ান দুই দিকেই। গরুর পরেই ব্রাহ্মণের কথা, এখানেও সেই মৌলিক পার্থক্য। ইউরোপে যাজকতা কর্ত্তে গেলে পণ্ডিত হ'তে হয়, সাধন কর্ত্তে হয়, শিখতে হয়। এখানে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের নীচেই পুরুৎঠাকুরের স্থান ; "বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ" হ'লেই, পুরুত-ঠাকুর আর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। গো-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ত এই বিভিন্ন ব্যবহার বিভিন্ন মনেরই লক্ষণ।

তারপর আহার, আমরা সাত্ত্বিক আহার করে' থাকি ; ইউরোপীয়গণ যা পায় তাই খায়, কে জানে সাত্ত্বিক, কে জানে অ-সাত্ত্বিক আমরা খাই উদ্ভিদ, তা'রা খায় প্রাণী, এই জন্য আমরা অচল, আর তা'রা সচল প্রাণবন্ত কি না তা আমি বল্‌তে পারচি না ; তবে পশু-পক্ষীর analogy থেকে এটা দেখতে পাই, যে নিছক সাত্ত্বিক আহার খেয়ে, হাতি থেকে আরম্ভ করে' রাম-ছাগল পর্য্যন্ত, পরের বোঝা বয়, আর প্রাণীবধ করে' তা'র রক্ত পান করে' খেঁকশিয়ালটা পর্য্যন্ত কারও হুকুমবরদার নয় ; আমরা হয়ত হাতিতে চড়ে' ইন্দ্রের সভায় গিয়ে উপস্থিত হব, আর ইউরোপীয়েরা পশুরাজের সঙ্গে নরকের আগুনে পুড়ে মরতে যাবে, তা হ'তে পারে ; তা হ'লে আমরা spiritual আর তা'রা material এইটেই ত প্রমাণ হ'চ্চে !

তারপর আমরা যার-তার হাতে খাই না, অন্ততঃ ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলসখানাও কাঁধে পড়ে থাকা চাই, তবে তা'র হাতে খাব ; আর ইউরোপীয়েরা যার-তার হাতে খাবে, সে "কিবা হাড়ি কিবা ডোম"। তাদের এমনি materialistic বুদ্ধি যে তা'রা মানুষে মানুষে প্রভেদ দেখতে পায় না ; মানুষ কি পশু না পাখী যে সব সমান হ'বে? অষ্ট্রেলিয়ার steppes এ না হয় সব ঘোড়া সমান, কিন্তু আড়গড়ার ভেতর পুরলে, ঘোড়ার শ্রেণীবিভাগ হ'য়ে, কোনটা ঘোড় দৌড়ের মাঠে যায়, আর কোনটা scavenger গাড়িতে জোড়া হয় ; মানুষেরও কি তাই নয়? কিন্তু সে সূক্ষ্মদর্শন ওদের নেই, আমাদের আছে,—আমরা তা'র ব্যবস্থা করেছি, শ্রেণীবিভাগ করেছি, কারও হাতে খাই কারও হাতে খাই না। তবে মনের খাদ্য আহরণের বেলা তা'রা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারো হাত থেকে বা মুখ থেকে গ্রহণ করে না ; বিশিষ্ট জ্ঞান ও সাধনার পরিচয় যে না দিয়েছে, তা'র কাছ থেকে তা'রা জ্ঞানের কথা শুন্‌বে না ; আর আমরা লম্পটের মুখেও বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনব, ভূতের মুখেও রাম নাম শুনে ধন্য হ'ব। এটা আমাদের আধ্যাত্মিকতারই পরিচয় ; কারণ আমরা চাই জ্ঞান, মানুষটা ত উপলক্ষ মাত্র, আমরা হংসের মত নীর পরিত্যাগ করে' ক্ষীর গ্রহণ করতে সক্ষম !

তাদের ধর্ম্মপুস্তক, ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মমন্দির থাকলে কি হয়, তারা পরলোক মান্‌লে কি হয়, তা'দের চরম বিচারকের বিচারে আস্থা থাকলে কি হয়, যেহেতু তা'রা ইহলোকটাকে উড়িয়ে দেয় নি, আর পরলোকটাকেই সর্ব্বস্ব করে' তোলে নি,

তাদের আধ্যাত্মিকতা ভাক্ত, আর আমাদেরটাই খাঁটি, তা'র কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

ঠিক এই পর্য্যন্ত লিখিচি আর নসীরাম বাবু এসে উপস্থিত—

নসীবাবু। কি ঠাকুর আবার মাথা গরম করচ যে!

আমি। লোকে কথা কয়েই ত মাথা গরম করে, আর মাথা ঠাণ্ডা করে' লেখে।

নসীবাবু। তোমার যে সব সৃষ্টিছাড়া। তা যাই হ'ক, কি লেখা হ'ল?

আমি। আজ্ঞে, আপনারাই যে ভগবানের chosen seed তাই প্রমাণ করে' দিলুম, আপনারাই the salt of the earth, আপনারাই leaven, that will leaven the whole তারই চূড়ান্ত মীমাংসা করে' দিলুম; পশ্চিম বলতে মোটা, আর পূর্ব্ব বলতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম—এইটে আধ্যাত্মিক ভাবে দাঁড় করিয়ে দিলুম।

নসীবাবু। সব দেশেরই আপনাপন আধ্যাত্মিকতার ধারা আছে; আপনাপন সুখশান্তির অনুকূল পন্থা সব দেশেরই মনীষীরা আবিষ্কার করেছেন, আপনাপন দেশের পূর্ব্বাপর পরিকল্পনা করে' তাকে গড়ে' প্রয়োগ করেচেন।

আমি। তা ত করেচেন, কিন্তু আপনারাই যে স্বর্গের সিঁড়ি আবিষ্কার করেচেন এই আস্ফালনটা বড় বেশী রকমের শুনচি তাই ব্যাপারটা একটু চিরে দেখলুম।

নসীবাবু। কি মোটের মাথায় দেখলে ?

আমি। আজ্ঞে, দেখলুম, আপনাদের দাবীটা একেবারে ভুয়ো।

নসীবাবু। নিরেট করতে হ'লে কি একটু আফিম্ চালা'লে হয় মনে কর ?

আমি। মন্দ হয় না, কেননা সবটার ভিতর আফিমের মৌজ রয়েছে, আর ঐ সত্য বস্তুটাই নেই ; আফিমের ভিত্তির উপর অবস্থিত হ'লে অন্ততঃ কার্য্য-কারণ বোঝা যেত ; কারণ আফিম্ না খেয়ে এত খেয়াল দেখাটা ব্যাধি বলেই সন্দেহ হয়।

২৮

স্কুল-মাষ্টার না মোশন-মাষ্টার

স্কুল-মাষ্টার আর মোশন-মাষ্টার একই পদার্থ; একজন রঙ্গমঞ্চে হস্তপদ সঞ্চালন কর্ত্তে, গর্জ্জন কর্ত্তে শেখান, আর-একজন জীবন-রঙ্গমঞ্চে নানা ভঙ্গীতে নর্ত্তন কুর্দ্দন করতে শিখিয়ে দেন। জীবনটা যে অভিনয় মাত্র, আর অভিনয় ত অভিনয় বটেই, এইটা মাষ্টার-যুগলে যথাক্রমে ছাত্রগণকে শিখিয়ে থাকেন; তা'তে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের কোন উন্নতি হ'ক আর নাই হ'ক, এই "সঙ্-সার" অভিনয়টা

বাতুলের গল্প এ জীবন
অর্থহীন মাত্রবহু-বাক্য-আড়ম্বর,

এই কথার সার্থকতা সম্পাদন করে।

একজন বিশিষ্ট ইংরাজ নট সম্বন্ধে স্তুতিগান করে' বলা হয়েচে—We loved Hawtrey (Sir Charles Hawtrey) so much because he was "such a lovely liar". He lied with such perfect plausibility and success that —altho' one knew it quite well—one forgot that the whole of the lines had been written for him. He always appeared to be rolling his tarradiddles

out from his inner consciousness. Which, of course, was where the art of the man came in.

রসজ্ঞ দর্শক বলচেন—Hawtreyর অভিনয় দেখতে দেখতে ভুলে যেতে হয় যে অভিনয় দেখছি; বাক্য-স্রোতটা তা'র যেন অন্তরতম সত্তার ভিতর থেকে উথলে উঠচে; কিন্তু বস্তুতঃ সে আর-একজনের রচিত ছত্রগুলিই আবৃত্তি করচে মাত্র; এ থেকে বল্‌তেই হয় --Hawtrey একজন "lovely liar".

আমাদের স্কুলে (আমি কলেজ বা Post-graduate'ও তা'র মধ্যে ধরে নিয়েচি) স্কুল-মাষ্টার এই "lovely-liars" সৃজন করে' সংসার-রঙ্গমঞ্চে ছেড়ে দিচ্ছেন। অভিনেতৃগণের অভিনয় যতই স্বাভাবিক মনে হ'ক না, তাঁদের বক্তৃতা স্রোত যতই বেগে তাঁদের অন্তরতম সত্তার মধ্য থেকে উৎসারিত হ'ক না, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলবার দরকার নেই যে "the whole of the lines had been written for him."

এই অভিনয়ের rehearsal প্রতিদিন স্কুল কলেজে হ'য়ে থাকে। স্কুল কলেজগুলো সে অর্থে—আখড়া ঘর, আর স্কুল-মাষ্টার সুধু—মোশন-মাষ্টার। মেস্, ক্লাব ইত্যাদিতে যে "সাঁঝে সকালে" তর্ক বিতর্ক—সান্‌ইয়াট সান্ থেকে C. R. Das পর্য্যন্তকে নিয়ে যে তর্ক কচ্‌কচি,—ত্যাগ, স্বাধীনতা, policy, politics, স্বদেশী, Non-Co-operation এ সমস্ত কথার বিচারবিশ্লেষণ হয়—সে কেবল part মুখস্থ করা মাত্র। যেহেতু এ সমস্ত বীর্য্যবান বক্তৃতা ইত্যাদি জীবন-রঙ্গমঞ্চে অভিনয়েরই সহায়তা করে' থাকে।

আমি সে দিন এক M. A. ছাত্রের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম, তিনি Economics নিয়েচেন ; তাঁকে প্রশ্ন কল্লুম—বাপু এই যে Fiscal Commission বসল, তা'রা কি মীমাংসা কল্লে কিছু জান ? বাছা আমার অনেক মাথা চুল্‌কে উত্তর দিলেন—আজ্ঞে আমাদের Professor এখনও Note দেন নি। অর্থাৎ মোশন-মাষ্টার এখনও মোশন দেন নি, অতএব বাছা এখনও অচল।

আর-একটি ছেলে Anthropology নিয়েচেন M.A.তে ; একজন অধ্যাপকের সঙ্গে সেই বিষয়ে কথা কচ্ছিলেন ; আমি ঝিমুচ্ছিলুন, তথাপি এই কথাগুলো কানে গেল—

অধ্যাপক। এত-দেশ থাক্‌তে Anthropology নিলে কেন হে ?

ছাত্র। কি জানেন, বিষয়টা নতুন, পাস কর্ত্তে পারলে একটা Professorই লাগ্‌তে পারে।

সুতরাং তাঁর Anthropology পাঠটা পার্ট মুখস্থ ভিন্ন আর কি ? এই নতুন বলে', দিনকতক Commerce, Commerce করে' ছেলেরা খেপল ; উদ্দেশ্য ব্যবসা করা নয়, কারণ সে পথে ব্যবসা শিক্ষা হয় না, প্রফেসারি জুটতে পারে এই আশা। তবেই হ'ল, রঙ্গমঞ্চে ভীম সাজা, ভীম হব বলে' নয়, ভীমের জন্য লিখিত বক্তৃতা আবৃত্তি করে' বাহবা ন'ব বলে' ; তেমনি Commerce পড়ব ব্যবসা করব বলে' নয়, Commerce সম্বন্ধে বুলি কেটে, অর্থাৎ lecture দিয়ে, পয়সা রোজকার করব বলে'।

একজন যাত্রায় হনুমান সেজেছিল ; পাছে কেউ তা'কে সত্যি

হনুমান মনে করে' ফেলে, সে জন্য হুপ্ হাপ্ করতে করতে সে বলে' উঠল—"মহাশয়রা গো, আমি সেজিচি, আমি সত্যিকারের হনুমান নই; অধিকারী মহাশয় আর লোক পান নি তাই আমায় সাজিয়েচেন।" লোকটার বোধ হয় একটু মাথা খারাপ ছিল; নহিলে অভিনয়ের মধ্যস্থলে তা'র স্বরূপ জাহির করবার প্রবৃত্তি আসবে কেন? আমাদের এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয় হয়, রামেরই হ'ক বা রামানুচরেরই হ'ক, তা'কে চিনে নিতে কারও বেশী দেরী হয় না; কিন্তু তাদের মধ্যে এমন মাথা-খারাপ কেউ নেই যে অভিনয় পণ্ড করে' নিজমূর্ত্তি জাহির করেন—সেটা অভিনয় শেষে সাজ-ঘরের জন্যই তোলা থাকে।

এই সাজ-ঘরটা কোথা? যেখানে অভিনেতা নিজ মূর্ত্তিতে সপ্রকাশ হ'ন, যেখানে সত্যিকারের আঁতের কালি ফুটে ওঠে, যেখানে শেখা-বুলি বা মুখস্থ partএর আবৃত্তি মোটেই চলে না—সে সাজঘর কোথা? আর কোথা – যেখানে চোগা চাপকান, হ্যাট কোট, তিলক টিকি, গান্ধী-টুপী পর্য্যন্ত খুলে ফেলে "ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধন-চিন্তয়া" সতত ব্যস্ত থাকতে হয়, যেখানে কথায় চিঁড়ে ভেজে না, চিঁড়ে জোটেও না,—যেখানে যা'র ভিতর যতটুকু শক্তি আছে, যতটুকু বুদ্ধি আছে, যতটুকু হৃদয় আছে, তা'রই মাপে সুখদুঃখ মিলে,—যেখানে ভিতরকার মানুষটা উলঙ্গ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ কর্ত্তে বাধ্য হয়,—সেই গৃহস্থলীই হ'ল সাজঘর, সেখানে সাজ খুলে কথা কইতে হয়, সেখানে আর মেকি চলে না! স্ত্রী, পুত্র, জননী, দুহিতার কাছেও যে অভিনয় কর্ত্তে পারে সে

জবর অভিনেতা বটে ; কিন্তু তেমন অভিনেতা স্বর্গে মর্ত্ত্যে নাই।

সেই সাজঘরের বাহিরে এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে যা কর তা শোভা পাবে, রাজাই সাজ আর ঋষিই সাজ মানিয়ে যাবে, লোকে মেনেও নেবে ; কেননা "কানা, মনে মনে জানা", সকলেই সেজেচে, তুমিও সেজেচ ; অভিনয়ের বাহাদুরী পাবে ; যদি নিন্দাই জোটে, সেও অভিনয়ের গলদের জন্য। তাই কাউন্সিলে radical সেজে যে ঘরে এসে ultra-conservative হও,—সমাজ সংস্কার নিয়ে বক্তৃতা করবার সময়, "ঝাড়ে বংশে" (root and branch) উৎপাটনের উপদেশ দিয়ে, দুধের মেয়ের বিয়ে না দিতে পারলে যে অস্থিরতা প্রদর্শন কর,—কাগজে-কলমে বাল-বিধবার দুঃখে নয়নের জলে বুক ভাসিয়ে, বিধবা ভগ্নীর বা কন্যার দুঃখ যে চোকে ঠেকে না,—কথায় কথায় সাম্য মৈত্রীর ধুয়া তুলে, সামাজিক ব্যবহারে যে ব্রাহ্মণ বলে' ফুলে ওঠ, বা শূদ্র বলে' নাক সিটকাও—এ সব কেবল স্কুল-মাষ্টারের কাছে part মুখস্থ করেছ বলে'। কাউন্সিল বল, বক্তৃতামঞ্চ বল, সংবাদ পত্র বল, কোথাও তোমার ভিতরকার মানুষটা জোর করে' আত্মপ্রকাশ করে না, তুমি সুধু সর্ব্বত্র অভিনয়ই করে' যাও। সকলে তা বুঝতে পারে, তবু অভিনয়ের বাহাদুরী যদি কিছু থাকে তা'রই বাহবা তোমার প্রাপ্য, তাই তুমি পেয়েও থাক।

কিন্তু কথা হচ্চে এই—যাদের দেশের বিদ্যা নিয়ে তুমি নাড়াচাড়া কর, তাদের দেশের ছেলেরা ত সেই বিদ্যা নিয়েই সসাগরা পৃথিবীটাকে মুঠোর ভেতর করবার মত শক্তি লাভ করে ; তুমিও

সেই বিদ্যা জীবন-পণ করে' অর্জ্জন কর, কিন্তু কোন্ দেবযানীর অভিসম্পাতে সে বিদ্যার প্রয়োগ কর্ত্তে পার না? তা'রাও Science পড়ে, Economics পড়ে, Anthropology পড়ে, তাদের সে বিদ্যা অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ ক'রে তাদের শক্তিশালী করে' তোলে, আর তোমাকে সুধু নটের নিপুণতা ছাড়া আর কিছু দেয় না কেন?

একজন পণ্ডিত এই রকম প্রশ্নের উত্তরে বলেচেন—The divorce of our actual life from the life of our ideas has made us a race of neurasthenics, অর্থাৎ আমাদের প্রকৃত জীবনগতি আমাদের ভাব সম্পদের সঙ্গে খাপ খাচ্চে না বলে' আমরা বায়ু রোগগ্রস্ত হ'য়ে পড়েচি। আমরা ভাবটা নিচ্চি পাশ্চাত্য পুঁথি থেকে, আর আমাদের জীবনটা গড়ে উঠেচে আমাদের অতীতের সংস্কার সমষ্টি নিয়ে,—এই দুটাতে মিল্‌চে না বলে' আমাদের শরীরে বায়ুর প্রকোপ কিছু বেশী হ'য়ে উঠেচে। সকলেই জানেন নট-নটী মাত্রেই একটু বেশীমাত্রায় neurasthenic—একটু বায়ুগ্রস্ত। উক্ত পণ্ডিতের মতে আমাদের মধ্যে a real sense of independence in both thought and action আনতে হবে, তা হ'লেই বায়ুর সমতা হ'য়ে আমাদের actual life এর সঙ্গে আমাদের ideas মিলে যাবে।

পণ্ডিতজী রোগটা ধরেচেন ঠিক, আর দাওয়াইও ঠিক বাত্‌লেচেন; কিন্তু সম্পূর্ণ দাওয়াইটা বাত্‌লান নি। নূতন idea এসে আমাদের বহুবার আক্রমণ করেচে; সিকন্দর থেকে আরম্ভ করে'

বুদ্ধ চৈতন্য পর্য্যন্ত অনেকবার নূতন idea আমাদের যা দিয়েচে—কিন্তু সে সব ideaকে আমরা আপনার করে' নিয়েচি—আমাদের জীবনের মধ্যে থাপ খাইয়ে নিয়েচি—কিন্তু এখন আর পাচ্চি না কেন? তা'র উত্তর, জীবন ছিল তাই আয়ত্ত করেছি—বিষ খেয়েও নীলকণ্ঠ হ'য়ে বেঁচেছিলুম—বেদ ছেড়ে বৌদ্ধ হ'য়েও সসাগরা পৃথিবী জয় করেছি—এখন জীবন নেই, তাই বাহিরের জিনিষ আর ভেতরে যায় না, রক্তের সঙ্গে মেশে না—এ যেন মড়ার গায়ে injection করা—যেখানকার injection সেইখানেই থাকে।

এখন বাঁচার উপায় কি? বাঁচার উপায়—independence in both thought and action; কিন্তু সে independence আসে কোথা থেকে? চিন্তার স্বাধীনতা কতক সম্ভব, কিন্তু কার্য্যের স্বাধীনতার ক্ষেত্র কোথায়? সত্যিকারের কার্য্যের ক্ষেত্র নেই, তাই অভিনয় করে' দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হচ্চে।

২৯

ভদ্রলোক

ভদ্রলোক, ভদ্দরলোক, bhadralog, gentleman—এ সব কি একই পদার্থের ভিন্ন নাম? আমার যেন খটকা লাগে!

শেষের দিক থেকে আরম্ভ করা যাক্ বিচার কর্ত্তে।

Gentleman বোধ হয় সেই শ্রেণীর লোককেই বলে; যারা গতর খাটিয়ে খায় না, একটু জমী-জমা আছে বা ব্যাঙ্কে টাকা আছে, বা মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে বা বিদ্যা আছে—তাই থেকে চলে; অর্থাৎ দোকানদারী করে' বা মাটি খুঁড়ে শস্য উৎপন্ন করে' যাদের পেট ভরাতে হয়, তা'রা এই gentleman পর্য্যায়ের একটু নীচে। তবে দোকানটা কিছু বড় রকমের হ'লে, এবং চাষের জমী একটু বিস্তৃত হ'লে, যখন সেটা যথাক্রমে হৌস্ বা জমীদারীর বিশালতা প্রাপ্ত হয়, তখন হৌসওয়ালা বা জমীদারকে gentleman পর্য্যায়ে স্থান দিতেই হয়, বা তা'র উপরেও দেওয়া চলে। কিন্তু সে বিশালতার পরিমাণ কি, তা'র কোন নির্দ্দিষ্ট মাপকাটি না থাকায়, মাঝে মাঝে একটু গোল হয়।

When Adam delved and Eve span
Who was then a gentleman?

এই বহু পুরাতন প্রবচনের মধ্যে gentlemanত্বের সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ত্তমান রয়েছে। মাটি খুঁড়ে যখন পুরুষমাত্রেই শস্য উৎপন্ন করত আর স্ত্রীমাত্রেই চরকায় সূতা কাটত, তখন সমাজে gentlemanএর কোটায় কেউ ছিল না; তখন gentlemanএর সৃষ্টিই হয় নি। Gentlemanটা একেবারেই খুব হালি জিনিষ। কেউ কেউ বলেন ওটা খুব বাজে জিনিষ—সভ্য সমাজ-যন্ত্রের একটা অনাবশ্যক bye-product মাত্র।

কেউ কেউ বলেন gentlemanএর জাত নেই; অর্থাৎ সমাজের যে-কোন শ্রেণীর ভিতরে gentleman পাওয়া যেতে পারে। এ কথা আর যে কোন দেশে সত্য হ'ক, আমাদের দেশে হ'তে পারে না। যাদের বামুন-শূদ্র জ্ঞান আছে, অর্থাৎ হ্রস্ব-দীর্ঘ বোধ আছে, তা'রা একথা কোনক্রমেই মানতে পারে না। যারা ছাতু খায়, বা পকাল ভাত, বা পরিষ্টি ভাত খায়, মালকোছা মেরে কাপড় পরে, বা পাঁচি ধুতি পরে', সুধু পায়ে, সুধু গায়ে থাকে, তা'রা কি gentleman হ'তে পারে?

আমি কলকাতায় এক মেসে দিন কতক বাস করে' এসেছি—মেসের পাশে একটা মস্ত তেতলা বাড়ীতে এক মস্ত ধনী পরিবার বাস করতেন, তেতলা ঘরের জানলায় অনেক সময় মা-লক্ষ্মীরা একটু বে-আবরু ভাবে দাঁড়াতেন বসতেন,—২০৷২৫টা ওরস্থা যুবাকে ভ্রূক্ষেপ না করে'। একদিন শুনা গেল এক বৃদ্ধা ঝি, বাতায়নে দণ্ডায়মানা এক যুবতীকে বলচে,—সরে এস, মেসের ছেলেগুলোর সুমুখ থেকে—

যুবতী। ওদেরকে আবার লজ্জা কিসের? ওরা যে বাসাড়ে,—শুরা ঝি না এলে বাসন মাজে, ঠাকুর না এলে রাঁধে। ওদের দেখে বুঝি আবার লজ্জা করতে হবে?

মা লক্ষ্মী বোধ হয় gentlemanকে লজ্জা করতে প্রস্তুত, কিন্তু যারা ঝি-চাকরের মত বাসন মাজে বা রাঁধে তা'রা কি gentleman হ'তে পারে? ঠিক বলচেন মা আমার!

কিন্তু কথা হচ্চে এই যে—লাঙ্গল ঠেল্‌লে, আর চরকা কাটলেই, এবং উপরোক্ত মাতাঠাকুরাণীর হিসাব-মত বাসন মাজলে বা রাঁধলেই যদি gentleman সম্প্রদায়ের নীচে যেতে হয়, তা হ'লে সে সব কাজ না করে' যদি দিনগুজরাণ হয়, তা হ'লেই কি gentleman হওয়া চলে?

এই ধরুন,—চোর ডাকাতের কথা বাদ দিয়ে—আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, আমার জমী নেই, জমা নেই, ব্যাঙ্কে টাকা নেই, মাথায় যে খুব বুদ্ধির প্রাচুর্য্য আছে তা'ও নয়, আমি আকাশের পাখী, বনের পশু ও জলের মাছের মত do not sow, nor do I reap —আমি মাটি কাটি না, চরকা ত কাটিই না (গান্ধীজীর হুকুমেও নয়, কিম্বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়েও নয়), চুরি-চামারীও করি না—অথচ আমার পেট চলে, নির্ভাবনায় দিন কেটে যায়, আমি gentleman কি না? ইংরাজিতে mendicant বলে' একটা কথা আছে, আমাকে হয়ত সেই শ্রেণীরই ভেতর ফেলা হবে; তা হ'লেই বিচারটা একটু জটিল হ'য়ে আসচে—

আমি কিন্তু প্রমাণ করে' দেব যে, ঐ mendicant আর

gentleman এই দুইই এক শ্রেণীর জীব । উভয়েই চাষ করে না, মুদিখানার দোকান করে না, চুরি করে না, অথচ পায়ের উপর পা দিয়ে বসে' খায়। উভয়েই নির্ভাবনা, কিন্তু উভয়েই ভিক্ষুক। জমীদার ভিক্ষা করে খাজনা, আর ভিক্ষুক ভিক্ষা করে অনুগ্রহ; একজন জোর করে' চাইতে পারে, আর-একজন আস্তে চায়, ভয়ে ভয়ে চায়—এই তফাৎ। কিন্তু পাওয়াটা সম্পূর্ণরূপে দাতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর। প্রজা যদি না দেয়—Civil disobedience করে' বসে—আর দাতা যদি মুটো না খোলে, তা হ'লে getlemanও পায় না, mendicantও পায় না। অতএব দুইই এক। তবে লোকে gentlemanকে অর্থাৎ জমীদারকে, ধনীকে, একটা জাঁকাল নাম দিয়েচে এবং খাতিরও করে—সেটা একটা কালক্রমাগত কু-অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নয়।

"খদ্দর পরে' ভদ্দর" হবার যে একটা ধুয়া উঠেছে, সেটার ভিতর একটা তত্ত্ব আছে। ব্যবহারিক জীবনে বাহিরটা দেখে খানিকটা ভিতরটার অবস্থা আন্দাজ করে' নিতে হয়। তা'তে অনেক সময় ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে; আর এই সম্ভাবনার advantage লোকে নিতে চায় ; টিকি রেখে, শামুকের খোলকে নস্যির ডিপে করে' পণ্ডিত, লপেটা পরে' বাবু, আর খদ্দর পরে' ভদ্দর—এ সবই একই শ্রেণীর প্রক্রিয়া। "ভদ্রলোক" বলতে এই "কাপুড়ে" ভদ্রলোকই বুঝতে হবে অধিকাংশ স্থলে।

বাঙ্গালা অভিধান খুলে দেখলুম যে, ভদ্র মানে "সুবর্ণ", আর ভদ্র মানে "ষাঁড়"। এই দুই অর্থের সঙ্গে আমাদের

অধুনা প্রচলিত ভদ্রের কি সম্বন্ধ, বিচার করা দরকার হয়েচে।

ভদ্র মানে সোণা, অর্থাৎ যাঁদের সোণা আছে তাঁরা ভদ্র; পয়সা থাকলেই ভদ্র, এ ত একটা প্রচলিত acceptation, পয়সা থাকলেই বাহিরটাকে চুণকাম করে' ভিতরের কালি ঢাকা দেওয়া যায়, সুতরাং যে কোন উপায়ে সুবর্ণের সংস্থান কর্ত্তে পারলেই, ভদ্দর হওয়ার পথ পরিষ্কার হ'য়ে যায়। যাঁরা বলেন পয়সা থাকলেই ভদ্দর হয় না, তাঁরা নিজে সে রসে বঞ্চিত বলেই বলেন।

আর ভদ্র মানে ষাঁড়—উক্ষা ভদ্রো বলীবর্দ্দঃ ঋষভো বৃষভো বৃষঃ ইত্যমরঃ—অর্থাৎ সেই ভদ্র যে ষাঁড়। এ অর্থ কোথা থেকে এলো তা'র তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হয়। মনুষ্য-গোষ্ঠীর একটা অবস্থা ছিল, যখন শরীরের বলই ছিল মূলাধার; যা'র ষাঁড়ের মত গোঁ ছিল, গুঁতোবার শক্তি ছিল, সেই ছিল মানুষ, আর সব অ-মানুষ; আর তা'র শিংএর প্রতি সেলাম দিয়ে লোকে বল্‌ত—ভদ্র, ভাল মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ, মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ। বল ছিল ভদ্রতার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ,—তাই ভরতর্ষভ, বলভদ্র, বীরভদ্র এই সব নাম হ'য়েচে। এই অর্থে ভদ্র কথাটা ব্যবহার হ'তে আরম্ভ হ'লে, কমলাকান্তর বড় সুবিধা হবে না—তা না হ'ক, আমি অভদ্রই হব, যদি আর সকলে এই অর্থে ভদ্র হয়।

৩০

নিরুপদ্রবের শেষ

কি কল্লে কি হবে তা কেউ বলতে পারে না; অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করবার ধৃষ্টতা রাখে বটে, কিন্তু ফলাফল মিলিয়ে দেখলে কোন ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু মিলেচে বলে' আমার জানা নেই। সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ বিষয়ে জ্যোতিষের formula আছে, সে formulaর কলে ফেলে সূর্য্যচন্দ্রের গ্রহণ পূর্ব্ব হ'তে গণনা করা যায় বটে, কিন্তু মনুষ্যজীবনে কি কল্লে কি হবে তা'র formula এ পর্য্যন্ত খুঁজে কেউ পায় নি।

আফিং খেলে মৌতাত হবেই এ পর্য্যন্ত কেউ ঠিক করে' বল্‌তে পারে না। আফিং খেলেও যে মৌতাত না হ'তে পারে তা'র প্রমাণ আমি কমলাকান্ত স্বয়ং—আমি একেবারেই ত এক ভরি ওজনে এসে পৌঁছাই নি, সর্ষপ পরিমাণ থেকে সুরু করে', ক্রমে মটর-ভর, তার-পর "বদরী সম", পরে "নবরঙ্গে" এসে দাঁড়িয়েছে; এই ক্রমোন্নতির কারণ হচ্চে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থায় মৌতাত না হওয়া। অহিফেন সেবন রূপ অতি সহজ ও সরল ব্যাপারে যখন ভবিষ্যদ্বাণী চলে না, তখন এতদপেক্ষা জটিলতর ব্যাপারে যে কি কল্লে কি হবে কেউ বল্‌তে পারবে না তা'র আর আশ্চর্য্য কি? তবে, কি কল্লে কি হবে বলা

শক্ত হ'লেও, কি করে' কি হয়েচে তা'র আলোচনায় ফল আছে; পূর্ব্বপক্ষ (antecedent) ঠিক জানা থাক্‌লে উত্তর পক্ষের consequent) নির্ণয় হ'তে পারে। কিন্তু ইহ-সংসারে শত জটিলতার মধ্যে পূর্ব্ব পক্ষটাকে চোচাপটে ধরা যায় না—এইজন্যই উত্তর পক্ষ সম্বন্ধে যা কিছু গোল হ'য়ে থাকে। History repeapts itself এই যে কথা আছে, সেটা স্পষ্ট বুঝা যায় ঘটনার পর; তবে বুদ্ধিমানেরা বলেন, স্থির বুদ্ধিতে বিচার কল্লে ঘটনার পূর্ব্বেও কতকটা আভাষ পাওয়া যেতে পারে। আমি তাই জোর করে' কিছুই বলব না, আমার সিদ্ধান্তটা ভবিষ্যদ্বাণী বলেও যেন কেহ গ্রহণ না করেন।

আমি কিছু দিন পূর্ব্বে সন্দেহ করেছিলুম—জার্ম্মাণি যে আমার অসহযোগনীতি গ্রহণ করে' আমাকে ও নীতিটাকে ধন্য করেচে সেটার শেষ পর্য্যন্ত মান রাখবে ত? আমি আরও বলেছিলুম, যে, গায়ের জোরের অভাব বলে' অর্থের খোঁটা ধরে' এখনও জার্ম্মাণ মেড়া লড়চে (এটা অবশ্য নিরুপদ্রব লড়াই), এ খোঁটা ভাঙ্গলে তা'র এ লড়াইও শেষ হ'য়ে যাবে। আমি তখন ভবিষ্যদ্বাণী করি নি, কিন্তু এখন দেখছি আমার কথাটা লেগেচে। জার্ম্মাণির প্রেসিডেণ্ট শেষ ঘোষণা কর্ত্তে বাধ্য হয়েচেন—In order to maintain the life of the people and the State we are to-day confronted with the bitter necessity of breaking off the fight (26 Sept. 1923).

দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জাতটাকে শত্রুর সঙ্গে নিরুপদ্রব অসহযোগ করে' শেষে রণে ভঙ্গ দিতে হ'ল, এর মধ্যে যে অদৃষ্টের পরিহাস

রয়েচে সেটা বড়ই ক্রূর ও মর্ম্মভেদী। দেশাত্মবোধ, বুদ্ধি, উদ্যম, অর্থসম্পত্তি এসকলের সমবায়েও নিরুপদ্রব অসহযোগ কোন কাজেরই হ'ল না। রুরের শ্রমিকদের অর্থ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার খরচ আর জার্ম্মাণি যোগাতে পাল্লে না; soul-force এর অভাব হয় নি, শেষে অর্থের অভাবেই সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। প্রতি সপ্তাহে ৩৫,০০০ "trillion marks" হিসাবে অর্থ আর জার্ম্মাণি যোগাতে পাল্লে না, অসহযোগের অবসান হ'য়ে গেল। যাঁরা জার্ম্মাণ যুদ্ধের ইতিহাস পর পর দেখে এসেচেন, তাঁরাই বলবেন জার্ম্মাণি যে দিন হটে গিয়ে Hindenberg lineএর পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করে' নিশ্চল হ'য়ে বসল, সেই দিনই তা'র পরাভব হ'য়ে গেছে—তারপর যতদিন যুদ্ধ চলেচে ততদিন সে ভেঙ্গেই পড়তে চলেচে; Versailles সন্ধিতে তা'কে একবারে নখদন্তহীন করে' বেঁধে ফেলা হ'ল; ফ্রান্সের দাবী মেটাতে সে পারলে না, বা চাইলে না—যাই বলুন, তারপরই রুর দখল হ'ল ও সেই সঙ্গে নিরুপদ্রব অসহযোগ আরম্ভ হ'ল। ফ্রান্সের টাকা দিতে বাধ্য হ'লে জার্ম্মাণির যে দুর্দ্দশা হবে, তা'র চেয়ে মৃত্যু ভাল, এই ভেবে জার্ম্মাণ-জাতি নিরুপদ্রব অসহযোগকে বরণ করে' নিয়েছিল; কিন্তু নিরস্ত্রের সে অস্ত্রও নিষ্ফল হ'ল। জার্ম্মাণিতে আজ সে নিষ্ফলতার ফল হয়েচে—অরাজকতা, আর খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ভেঙ্গে পড়া।

যুদ্ধ-শাস্ত্রের একটা আইন আছে—Victory can only be won as the result of offensive action; এ সত্য সকল যুদ্ধেই প্রমাণিত হ'য়ে গেছে, এ কথার যাথার্থ্য সকল তর্কের অতীত

হ'য়ে রয়েচে। অসহযোগ একটা প্রতিশেধক defensive action মাত্র। এ defensive action থেকে জয়শ্রী লাভ করা যেতে পারে না। অসহযোগ একটা মাঝামাঝি পথ—সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র—তা' থেকে জয়শ্রীলাভ কেউ কখন করতে পারে নি।

আমি একথা বল্‌তে চাই না যে অসহযোগ-নীতি অবলম্বিত হয়েচে বলে' আমাদের দেশেও আমি "নাশংসে বিজয়ায়"—তা'র দুটী কারণ, প্রথম, আমি ভবিষ্যদ্বক্তার আসন গ্রহণ করতে মোটেই রাজি নই, দ্বিতীয়, East is East and West is West—প্রতীচ্যে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে বলে' প্রাচ্যেও তাই হবে কে বল্‌তে পারে?

ইতি

প্রকাশক
শ্রীচারুচন্দ্র রায় এম্-এ

মূল্য এক টাকা

সাধনা প্রেস, চন্দননগর

বিজ্ঞাপন

যা'র "মুখবন্ধ" লেখবার কথা ছিল তা'র মুখ এখন বন্ধ; আমি সুধু এই পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হব, যে "কমলাকান্তের পত্র" এই নামে প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক ভাবে "নবসঙ্ঘ" ও "আত্মশক্তি" পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল; একটি "নিবন্ধ" পত্রেও প্রকাশিত হয়। পর পর যেমন ছাপা হয়েছিল, এ পুস্তকে প্রবন্ধগুলি সেই পর্য্যায় রক্ষা করেই ছাপা হ'ল, কোন প্রকার ওলট্‌পালট্ বা পরিবর্ত্তন করা হয় নি।

"মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে"—কমলাকান্ত সম্বন্ধে খোস্‌নবীশ জুনিয়ার প্রদত্ত এ সংবাদটা সত্যও হ'তে পারে; কিন্তু সে মরে নি এটা ঠিক। যুগে যুগে সে বেঁচে থাকবে—আর তা'র বক্তব্য তা'রই মতন করে' বলে' যাবে, তা'র ভুল নেই।

This fellow's wise enough to play the fool ;
And, to do that well, craves a kind of wit.
He must observe their mood on whom he jests,
The quality of persons, and the time ;
And *not* like the haggard, check at every feather
That comes before his eye. This is a practice,
As full of labour as a wise man's art :
For folly, that he wisely shews, is fit ;
But wise men folly-fallen quite taint their wit.

—*Twelfth Night. Act* 3. *Scene* 1.

সূচীপত্র